ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ।। ২৭ আষাঢ় ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১২ জুলাই, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

ভারতের 'ভিশন ডকুমেন্ট' চাই : শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ''স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সরকার দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও ভূখণ্ড রক্ষায় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এমনকী কর্তৃপক্ষের কাছে সীমান্তের বিশদ তথ্যও নেই।'' এভাবেই কেন্দ্র সরকারের প্রতি দোষারোপ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ২৩ জন নাগপুরে দৈনিক 'তরুণ ভারত' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক রবীন্দ্র দানী লিখিত বই 'ভিশন্ ডকুমেন্ট' এর উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন। শ্রী ভাগবত আরও বলেন, নেতারা শুধু আগামী নির্বাচনের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশগঠনের প্রতি লক্ষ্য নেই। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরবর্তী সময়ে বিশ্বের মধ্যে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে আমরা কোনও কার্যকরী পরিকল্পনাই করতে পারিনি। সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সীমান্তে আমাদের জমি হারিয়েছি। সেই হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবাসীর মনে উৎসাহ ও বিশ্বাস তৈরি করতে হবে।

নাগপুরের বসন্তরাও দেশপাণ্ডে সভাগৃহে পরিপূর্ণ শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশ্ন, স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে এবং কাশ্মীর ও অন্যান্য সীমান্তে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি—সেজন্য আমরা কি করেছি? স্বাধীনোত্তর ভারতে কোনও 'ভিশন্ ডকুমেন্ট' আমরা তৈরি করিনি। চীন, আমেরিকা এমনকী বাংলাদেশের মতো দেশও প্রতি দশবছর অন্তর সমীক্ষা করে পরবর্তী তিরিশ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা বা 'ভিশন্ ডকুমেন্ট' তৈরি করে। তারা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে দেশের ভৌগোলিক এলাকা ও সীমানা বৃদ্ধি করে। অথচ আমরা কাশ্মীর রক্ষার জন্য এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য এখনও লড়ে চলেছি। চীন নিয়মিতভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঢুকে পড়ছে, বাংলাদেশ অসমকে গিলে খেতে উদ্‌গ্রীব। চীন অরুণাচলের উপর তাদের মালিকানা দাবী করছে। জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখাকে (এল ও সি) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে যে কথাবার্তা চলছে শ্রীভাগবত তার তীব্র সমালোচনা করেন। আর এস এস প্রধান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, সারা পৃথিবীই

(এরপ ৪ পাতায়)

কলকাতা হাইকোর্টের রায়

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করতে গিয়ে জোরদার থাপ্পড় খেতে হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কে এম ডি এ-কে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জে এন প্যাটেল এবং বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২ জুলাই এক রায়ে জানিয়ে দিয়েছেন ''ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিক।'' কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলিতে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য এবছরের ১০ মার্চ বিজ্ঞাপন দেয় কে এম ডি এ। সেখানে বলা হয়েছিল— ফ্ল্যাটগুলির ২৬ শতাংশ সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ন্যাশনালিস্ট ল-ইয়ার্স ফোরামের পক্ষে আইনজীবী অমল চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যরা ওই প্রক্রিয়াকে জনস্বার্থ মামলায় চ্যালেঞ্জ জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালতের ওই রায়। এই মামলার আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন— কৌশিক চন্দ, জয়দীপ রায়, ধীরাজ ত্রিবেদী, কিঞ্জল বড়াল এবং অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। অ্যাডভোকেট কৌশিক চন্দ মামলাকারীদের পক্ষে আদালতে বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট বন্টনের যে নীতি কে এম ডি এ নিয়েছে, তা বৈষম্যমূলক। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। সুপ্রীম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, এখানে তাও লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে শ্রীচন্দের অভিযোগ। তিনি আরও বলেন, কে সংখ্যালঘু তার ব্যাখ্যা কে এম ডি এ দেয়নি। অথচ সেই ব্যাখ্যা ছাড়াই তারা সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুবিধা দিতে উদ্যোগী। কেন্দ্রীয় মাইনরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী, ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয় না। তাই কে এম ডি এ (কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)-এর এই প্রয়াস সম্পূর্ণ বেআইনী।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির এই রায় দেওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু তাঁর বদলী হওয়াতে রায়দান পিছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে প্রধান বিচারপতি পদে জে এন প্যাটেলের নিযুক্তি হয়। তিনি মামলাটির শুনানীর পর রায় দেন। এদিকে রাজ্য সরকারের দশ শতাংশ চাকরীতে মুসলমানদের জন্য ঘোষণার পরই রাজ্য জুড়ে সক্রিয় হয়েছে ''ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ বিরোধী মঞ্চ।'' বিভিন্ন জেলাতে জেলা শাসকদের কাছে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মঞ্চেরে পক্ষ থেকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ জুলাই মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া এবং এক সাংবাদিক সম্মেলনের কথা জানিয়েছেন মঞ্চের সভাপতি তথা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং প্রাক্তন আই পি এস ডঃ বাণীপদ সাহা।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন রামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৩৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য জান লড়িয়ে দিতে তৎপর। ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ যেখানে ৪ কোটি টাকা ছিল সেটা ২০১০-১১ আর্থিক বছরে বেড়ে হয়েছে— ৬৬৪.৪৬ কোটি (ছয়শত চৌষট্টি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা। অতি সম্প্রতি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা প্রতিমন্ত্রী ডঃ আবদুস সাত্তার (যদিও দপ্তরের ভার রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর হাতে) বিধানসভায় বিস্তারিতভাবে উপরোক্ত ৬৬৪.৪৬ কোটি কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করা হবে তার ব্যাখ্যাও করেছেন। তবে এই সবই সংখ্যালঘু বা মুসলিমদের জন্যই। মাদ্রাসা স্থাপন, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিপ্রদান মুসলমান মহিলাদের ক্ষমতায়ণ, মাদ্রাসার উন্নয়ন ও নতুন মাদ্রাসা স্থাপন, মুসলমান যুবক-যুবতীদের জন্য কারিগরী শিক্ষাদান, সুদহীন শিক্ষা-ঋণ, আল আমীন মিশনের মতো মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের স্পেশাল কোচিং প্রদানকারী সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য, কবরস্থানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর (বাউণ্ডারি ওয়াল) নির্মাণ প্রভৃতি ২০-২২ দফা বিষয় নির্দিষ্ট করে মন্ত্রীর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক

(এরপ ৪ পাতায়)

বিধানসভায় প্রার্থী হতে নারাজ বুদ্ধ

।। গূঢ়পুরুষ।। দলের ভিতরেই পরপর দুটি জোরদার ধাক্কা। তার পরিণতিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন যে বিধানসভার নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে চান না। সিপিএম সূত্রে জানা গেছে ক্ষুব্ধ বুদ্ধবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হবেন কিনা তা ভবিষ্যৎ সময়ই বলবে। তবে যে ভাবে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটির পর দিল্লীর পলিটব্যুরোর বৈঠকের মাঝপথে ক্ষিপ্ত বুদ্ধবাবু বেরিয়ে যান তারপর তাঁর পক্ষে প্রকাশ কারাট এণ্ড কোং-এর সঙ্গে ভাব-ভালবাসা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে আর মাত্র দশ মাস পরে নির্বাচনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে ভরাডুবি হলে তার দায় পুরোপুরি বুদ্ধবাবুকেই ঘাড় পেতে নিতে হবে। সেই ঝুঁকি তিনি নিতে চাইছেন না। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের আগে মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ভোটের ময়দান ছেড়ে প্রথম সুযোগেই পালিয়ে ছিলেন। তখন বুদ্ধবাবু মেয়রকে লড়াইয়ের ময়দানে ফেরাতে ব্যক্তিগতভাবে বহু চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন— মেয়র হচ্ছে পুরসভার নির্বাচনী লড়াইতে দলের প্রধান সেনাপতি। তিনি যদি স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান তবে ভোটদাতাদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। মনে করা হবে লড়াইয়ের আগেই দল পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। তবু মুখ্যমন্ত্রীর শত ভোকাল টনিকেও বিকাশরঞ্জনবাবুর মত পরিবর্তন

দলের ভিতরেই জোর ধাক্কা

করা সম্ভব হয়নি। প্রাক্তন মেয়র তখন তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন যে পার্টির কিছু ভুঁইফোড় নেতাদের ব্যবহারে (পড়ুন অত্যাচারে) তিনি ক্ষুব্ধ ও অপমানিত। আত্মসম্মান বজায় রেখে তাঁর পক্ষে নির্বাচনে দলের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। নিয়তির এমনই পরিহাস যে সেদিন যিনি ভোকাল মেয়রকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই বুদ্ধবাবু এখন নিজেই বলছেন, 'দলে সমালোচিত ও অপমানিত হয়ে নির্বাচনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।'

দলের ভিতরে বুদ্ধবাবু প্রথম সমালোচিত ও অপমানিত হন ১ জুলাই রাজ্য কমিটির বৈঠকে। তাঁর উপস্থিতিতেই সদস্যরা বুদ্ধবাবুর পরিচালিত পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়েই সরব হন। জেলার প্রতিনিধি সদস্যরা বলেন, প্রতিদিন দলের কর্মীরা মাওবাদী এবং তৃণমূলের হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন। পুলিশ-প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। অভিযোগ জানাতে গেলে থানা পাত্তা দিচ্ছে না। মহাকরণ থেকে পাঠানো নির্দেশ জেলায় মানা হচ্ছে না। দলের পক্ষ থেকে সে কথা মুখ্যমন্ত্রীকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে দলের ভিতরে সমর্থক-কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে যে বিপদের সময় দল পাশে দাঁড়াবে না। কলকাতার বড় বড় নেতারা নিরাপদে বাস করবেন। আর জেলায় দলীয় কর্মীরা মার খাবেন। প্রাণ হারাবেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধবাবু পুরোপুরি ব্যর্থ। খোলাখুলিভাবে বলা হয় কোনও যোগ্য তরুণ নেতাকে পুলিশ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হোক। সোজা সরল

(এরপ ৪ পাতায়)

রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৬ জুলাই সকালে কলকাতায় রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদ মূর্তির পাদদেশে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের ১০৯তম জন্মদিন পালিত হয়। শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

রাজ্যপালের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন শ্রী রাওয়াত।

নিবেদন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যপালের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্যপালের পক্ষ থেকে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ক্যাপ্টেন রাওয়াত, আর এস এসের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত ও নারায়ণ চন্দ্র পাল, রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিন্‌হা, সংগঠন সম্পাদক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, কাউন্সিলার মীনা দেবী পুরোহিত, শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির সহ-সভাপতি অমিতাভ ঘোষ, মিহির সাহা, তপন ঘোষ, অজয় নন্দী, স্বস্তিকা সাপ্তাহিকের পক্ষে বাসুদেব পাল প্রমুখ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

(এরপ ৪ পাতায়)

স্বস্তিকাকে জেহাদি হুমকী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এবার জেহাদিদের নিশানায় পড়ল কলকাতা থেকে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'। গত ২৩ জুন রাত্রি থেকে শুরু করে ২৪ জুন দুপুর তিনটে ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত স্বস্তিকার দপ্তরে একটি মোবাইল থেকে জনৈক ব্যক্তি স্বস্তিকা দপ্তর উড়িয়ে দেবার হুমকি দিতে থাকে। যে মোবাইল থেকে বেনামী ব্যক্তিটি ফোন করেছিল তার নম্বর— ৯০০২১৮৪৫০৬, এটি এয়ারটেল কোম্পানীর নম্বর।

ভারত ও আমেরিকার গোয়েন্দা সতর্কতাকে ভিত্তি করে গত ১৪ জুন সংখ্যায় সাপ্তাহিক স্বস্তিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যার শিরোনাম ছিল— ''জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান বিপদ ইসলাম।'' ফোনে ওই সংবাদ উল্লেখ করে কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ দেওয়া হয়।

প্রথম প্রথম স্বস্তিকা'র কর্মীরা ওই ফোনকে পাত্তা দেননি। পরে লালবাজারে কন্ট্রোলরুমে ফোন করে বেলা ৩-১৫ মিনিট নাগাদ বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। স্থানীয় আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা থেকে তিনজন অফিসার সহ পাঁচজন পুলিশকর্মী আসেন। যাঁরা ফোন (মোবাইল) রিসিভ করেছিলেন তাদের

Vandana
স্বস্তিকা
আসবাব
খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট
জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান বিপদ ইসলাম

প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন এবং সেইসঙ্গে অফিসের সামনে পুলিশ মোতায়েন হয় যা এখনও বহাল আছে। পরদিন দুপুরে ডি সি—এস বি-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা দপ্তরে পরিদর্শন করে সবকিছু আগাগোড়া জেনে যান। সাদা পোষাকেরও পুলিশ স্বস্তিকা দপ্তরে নজর রাখছেন বলে জানা গেছে। এদিকে স্বস্তিকার কর্মীরা এই মোবাইল-থ্রেটকে স্বস্তিকার নির্ভীক সাংবাদিকতার পুরস্কার হিসেবেই দেখছেন। স্বস্তিকার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল বলে সকলের অভিমত। স্থানীয় থানার পক্ষ থেকে নিয়মিত স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

গত ২ জুলাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই 'মোবাইল থ্রেট' কলটি এসেছিল মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থেকে। এত সময় ধরে একই ব্যক্তি একই মোবাইল থেকে হুমকি দিয়ে গেল। সময়মতো লালবাজার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও জেহাদি সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ল না কেন— এটা এক রহস্য। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদে জেহাদিদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের খবর বেশ পুরনো।

কান্দির কালীমন্দির দুর্বৃত্তদের কবলে

সংবাদদাতা।। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার দোহালিয়া গ্রামের চারশো বছরের প্রাচীন কালীমন্দির আজ একশ্রেণীর দুর্বৃত্তের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে কান্দির মানুষেরা লক্ষ্য করছে, এক শ্রেণীর পাণ্ডাদের মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও পূজার উদ্দেশ্যে আগত সাধারণ ভক্তদের কাছ থেকে ধর্মের নামে ভীতি প্রদর্শন করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিজেদের পেশায় পরিণত করেছে। এছাড়া মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য কর্মীদের উপর সর্বদা প্রভুত্ব ও ভীতি প্রদর্শন করে মন্দিরের পরিবেশের পবিত্রতা এরা পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। এমনকী সকালে মন্দির খোলা, মঙ্গলারতি, দুপুরে মায়ের ভোগ, সন্ধ্যারতি এবং রাত্রে মন্দির বন্ধের কোনও নির্দিষ্ট সময় বলে নেই। মায়ের পূজার নামে তামসিকতার রাজ কায়েম করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দোহালিয়া মৌজার ৫৮৮, ১২৪০ নং দাগে অবস্থিত কান্দি কালীবাড়ী। জেমো ও বাঘডাঙ্গা রাজবাড়ীর তরফে শ্যামসুন্দর নারায়ণ রায় জানান যে তাদের পূর্বপুরুষগণ শ্রীমায়ের চরণে দেবোত্তর করে মন্দির সংলগ্ন জমি চিহ্নিত করে দেন। একই সঙ্গে দেবী মায়ের সেবার জন্য পুরোহিত, পরিচারক (পাণ্ডা), ঝাড়ুদার, ঢাকী নিয়োগ করেন এবং মন্দির উন্নয়ন ও নিয়মিত সংস্কারের উদ্দেশ্যে জমি দিয়ে লোক নিযুক্ত করেন। এছাড়াও মায়ের আভূষণের জন্য প্রচুর স্বর্ণালংকার দান করা হয়। অভিযোগ হলো—এবিষয়ে কোনও প্রতিকার করতে গেলে এই উচ্ছৃঙ্খল পাণ্ডারা তাদের আশ্রিত কিছু অসামাজিক মদ্যপ ও গুণ্ডা দিয়ে হুমকি দিতে পিছুপা হয় না। দেবোত্তর ছাড়া মন্দিরের আশেপাশে জায়গাগুলো দোকান ও মন্দির করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পুরোহিত নরেন্দ্র নারায়ণ শুকুলকে শিব মন্দিরের পিছনে পশ্চিম দিকে কিছু জায়গা দান করা হয় সেখানে অনাথ আশ্রম ও উপরে বৃদ্ধাশ্রম করার জন্য। কিন্তু এই লোলুপ উচ্ছৃঙ্খল পাণ্ডারা নানা অপপ্রচার চালিয়ে সেটি গ্রাস করার চেষ্টা করছে।

১৩১০ বঙ্গাব্দে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পাশেই সাধক বামাক্ষ্যাপার গুরুভাই স্বামী হরিহরানন্দ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধন ভজন করেন যা হরিহরানন্দ আশ্রম নামে খ্যাত। মায়ের মন্দিরের উত্তর দিকে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আজও বিদ্যমান। এবং তারও উত্তর দিকে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে স্বামী সত্যানন্দ ঠাকুরের শিষ্য স্বামী রামানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই অঞ্চলের সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উৎস স্থল হিসেবে মন্দির ও সংলগ্ন স্থানটি পরিণত হয়েছে।

হরিহরানন্দ আশ্রমটি বর্তমান সেবাইত নরেন্দ্র নারায়ণ শুকুল যথেষ্ট সংস্কার করে একটি ভব্য নবগ্রহ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং সেখান থেকে তিনি কিছু সেবা কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তিনি এক মহৎ উদ্দেশ্যে সেখানে একটি অনাথ সেবাশ্রম করতে চান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো— কালী মন্দিরের যে অশুভ চক্রী ব্যক্তিরা আছে তারাই বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মানুষদের ভুল বুঝিয়ে একত্রিত করছে যাতে আশ্রম তৈরি বিলম্বিত হয়। অথচ এই প্রতিবেদক চুক্তি পত্রটি দেখেছেন, সেখানে শুধু মাত্র অনাথ আশ্রমে অনাথ ছেলেরাই থাকবে। এই জায়গাগুলি অল্প মূল্যে কিনে ওই দালালচক্র প্রমোটারি করতে চায়। কিন্তু কান্দির বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষেরা মন্দিরের পবিত্রতা ও সুষ্ঠু পরিচালনা চাইছেন। চাইছেন স্থানীয় প্রশাসনেরও সাহায্য।

এই সময়

এতদিনে বিচার

প্রায় মাস আটেক আগের ঘটনা। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের জয়পুর টার্মিনালের পাতালে রাসায়নিক দুর্ঘটনায় মারা যান ১৩ জন। ঘটনার দোষীরা বহাল তবিয়তেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তারপর থেকে। অবশেষে গত ২ জুলাই জয়পুর থেকেই ইণ্ডিয়ান অয়েলের অভিযুক্ত ন'জন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর মধ্যে কর্পোরেশনের ওই রাজ্যের জেনারেল ম্যানেজার গৌতম বোসও রয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে 'ক্রিমিনাল নেগলিজেন্সে'র চার্জ আনা হয়েছে। মৃতের লোকজনদের একটাই প্রার্থনা— 'ভুপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো বিচার যেন এদের কপালে না জোটে।' কিন্তু ভয়টা যেন কাটছেই না। কারণ ক্ষমতায় তো সেই কংগ্রেস সরকারই।

পনেরোয় ওবামা

তড়িঘড়ি নোবেল পুরস্কারটা হাতিয়ে নেওয়া যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি তা এখন টের পাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা। সম্প্রতি র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী ওবামা-র র‍্যাঙ্ক পনেরো। এমন কিছু খারাপ নয়। তবে আরও ভাল করা যেত। বিশেষ করে বিল ক্লিন্টন যেখানে তেরো নম্বরে রয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, শান্তির জন্য কিছু না করেই ওবামার নোবেল প্রাপ্তি দেশবাসী ভালভাবে নেননি। যাইহোক, ওই তালিকায় সর্বাগ্রে রয়েছে ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের নাম। আব্রাহাম লিঙ্কন তিনে, জর্জ ওয়াশিংটন চারে, দু'য়ে রয়েছে থিওডোর রুজভেল্টের নাম। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ওবামার পূর্বসূরী জর্জ বুশের। তেতাল্লিশ জনের মধ্যে তাঁর নাম উনচল্লিশ নম্বরে।

ইংরেজি না শিখলে

হুঁ, হুঁ বাবা। এটা সাহেবদের দেশ। সাহেবরা গেছে তো হয়েছে কি? বাঙালী সাহেবরা তো আছে। তারা মাতৃভাষা শিখুক ছাই না শিখুক, ইংরেজিটা তো শিখেছে। এই সহজ কথাটাই বুঝল না এক গবেট জাপানী। ব্যাটা পেশায় সাংবাদিক, নাম— তাকেচি সাকুরাগা। লালগড়ের সংবাদ শ্রবণ করে তার ভারততীর্থে পদার্পণ এবং অতঃপর লালগড় গমন। একবর্ণ ইংরেজি শেখেনি। সুতরাং তার মাতৃভাষা না বুঝে পুলিশের সন্দেহ এ নির্ঘাৎ পি সি পি এ-র লোক। মুহূর্তে তোলপাড় মহাকরণ। সংবাদমাধ্যমে নিমেষে রটে গেল লালগড়ে লোমহর্ষণ মানে বিদেশী হানা। বাঁচোয়া যে তাকেচি-র সঙ্গে ছিল এক স্থানীয় সাংবাদিক সুজিত শর্মা। শেষমেশ সেই সকলকে বুঝিয়ে শান্ত করল। পুলিশ কর্তাদের ক্ষোভ, এই বাজারে একবর্ণ ইংরেজি না জানলে চলে!

তালিবানী রিমাইণ্ডার

লাহোরের সুফী ধর্মস্থান ডাটা-গুন্‌জ বক্সে হামলা চালাল তালিবানরা। এখনও অবধি মৃতের সংখ্যা ৪৪, আহত প্রায় ২০০-এর মতো। বছরখানেক পূর্বে প্রতিনিয়ত পাক-ধর্মস্থানগুলোতে আঘাত করত তালিবানরা। তাদের পাল্টা আঘাত করার চেষ্টা যে করেনি পাক সরকার তা নয়। কিন্তু বিশেষ যুত করে উঠতে পারছিল না। শেষে সরকার একটা কৌশল অবলম্বন করে। সেটা হলো মৌলবাদী উগ্রপন্থা। যার জন্য তালিবানরা পাক-সরকারের সঙ্গে একটা আপসে আসে। আপাতত বন্ধ হয় হামলা। কিন্তু গত মাস থেকেই আহমেদীদের ওপর হামলা দিয়ে তালিবানী হামলার প্রত্যাবর্তন ঘটে পাকিস্তানে। অবশ্য মাঝে মধ্যে টুকরো-টাকরা হামলা করে পাক-সরকারকে রিমাইন্ডার দেওয়ার কাজটা অব্যাহতই রেখেছিল তালিবানীরা। রিমাইণ্ডারটা হলো, ভারতের বিরুদ্ধে মৌলবাদী সন্ত্রাস অব্যাহত রাখতে হবে।

স্বাগত শত্রু

মধ্যে মধ্যে ইউ পি এ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উদারতাটা (বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রতি)-র কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। গত ১৫ মে ২০১০ তারিখের গেজেট নোটিফিকেশনের একটি কপি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব পাকিস্তানী নাগরিকেরা শর্তাধীনে বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছেন তাদেরকে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এদেরকে ১৯২১ সালের পাসপোর্ট আইন (এন্ট্রি টু ইণ্ডিয়া)-এর ৩ নং ধারা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এই না হলে দেশের সরকার! যে প্রতিবেশী (পড়ুন পাকিস্তান) অহরহ ভারতকে হুমকি তো দিচ্ছেই, উপরন্তু দেশের ক্ষতিসাধনেও যখন অগ্রসর তখন সেই দেশের লোকেদেরই (ঘর)জামাই-আদরে ডেকে আনছে মনমোহন সিং-এর সরকার। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশের শত্রুদেরও স্বাগত জানানোর প্রথা একমাত্র বোধহয় কংগ্রেসি অভিধানেই মেলে!

সুপ্রিম কোর্টের সতর্কবার্তা

গত ২ জুলাই দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেশের সমস্ত বেসরকারী পেশাদার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করে বলেছে, শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই আপোস করা যাবে না। বিচারপতি আর এম লোধা এবং এ কে পট্টনায়কের বেঞ্চ মহারাষ্ট্রের দশটি বেসরকারী কলেজের বিরুদ্ধে ওঠা যথোপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেন। এমনিতে মহারাষ্ট্রসহ অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে, সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরলে সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষা-নীতির কারণে শিক্ষা একটি 'পণ্য' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। যার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিচ্ছে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা। যে কারণে ব্যাঙের ছাতার মতো একের পর এক ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। যেখানকার কর্তৃপক্ষ শুধু টাকা কামানোর ওপর নজর দেন, শিক্ষার গুণগত মানের দিকে নয়। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টাকেই 'হাইলাইট' করতে চেয়েছেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আফজল গুরুর ফাঁসী ও জাতীয় নিরাপত্তা

যে কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কাছে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা প্রধান ও পবিত্র। রাষ্ট্র আছে, অথচ রাষ্ট্রটির কোনও নিরাপত্তা নাই, সার্বভৌমত্ব নাই— ইহা হইতেই পারে না। তাহা হইলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে, তাহা রাষ্ট্র পদবাচ্যই নহে। সর্বকালে সর্বদেশের সরকারের কাছে তজ্জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি সর্বপ্রধান। ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ স্বাভাবিক ভাবেই এই রাষ্ট্রের চালকগণের কাছে তাহাদের সাধের ও স্বপ্নের ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব; নিরাপত্তা ও সম্মানরক্ষার দাবী করিতেই পারে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টি কাহারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নহে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি একটি বিমূর্ত বিষয় নয়। ইহার লক্ষণ রাষ্ট্রের সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত, রাষ্ট্রের আছে নির্দিষ্ট অপরের দাবীহীন ভূমি; আছে একটি স্বাধীন সরকার, সরকার পরিচালনার জন্য আছে সংসদ, আছে আইন, আদালত ও মুক্ত, স্বাধীন জনগণ। ভারত ভূমি এক পবিত্র ভূমি। কিন্তু কবির ভাষায় ভারতমাতা কেবল মাটি দিয়া গড়া মৃন্ময়ী নহে! ইহার স্থান আমাদের চিত্তে। তাই কবিগুরুর ভাষায় ভারতমাতা চিন্ময়ী অর্থাৎ চিৎময়ী বা চিত্তের মাঝে যাহার স্থান।

ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সর্বপ্রধান পীঠস্থান হইল সংসদ। এই সংসদের উপর হামলা ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা। ভারতমাতার উপর আক্রমণ। এই সংসদের উপর হামলাকারী ভারতীয় সার্বভৌমত্বের শত্রু। এই হামলাকারী ভারতীয় জনগণের শত্রু, তাই এই হামলাকারীর সঙ্গে কোনওরকম আপোষ ভারতমাতার অসম্মানের সঙ্গে আপোষেরই সামিল। ভারতমাতার সম্মানরক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর বর্তাইয়াছে তাহাদের পক্ষে দয়ার সাগর, মায়ার প্রতিমূর্তি সাজা শোভা পায় না। দেশের স্বার্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি রক্ষা করিয়া চলা দেশের শাসকদের পক্ষে শুধু বিলাসিতার নামান্তর নয়, গর্হিত অপরাধও।

ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পীঠস্থান সংসদ আক্রমণ করিয়াছিল উগ্র ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরু। বহুদিন জেলে বন্দী থাকিবার ফলে তাহার পিছনে ভারতীয় জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের কত অপচয় হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতীয় আদালতের বিচারে তাহার মৃত্যু দণ্ডাদেশও হইয়াছে। কিন্তু কী এক গোপন কারণে তাহার মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর হয় নাই আজও। কাহার নির্দেশে সরকারী দপ্তরের মন্ত্রীরা এই দণ্ডাদেশের ফাইল চালাচালিতে বিলম্ব ঘটাইল, তাহা হয়ত এখন জানা যাইতেছে না। কিন্তু অ্যাণ্ডারসনের মামলার গোপন তথ্য যেমন এখন প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে, সেইরকম আফজল গুরুর দণ্ডাদেশের ফাইলের গোপন তথ্যও একদিন প্রকাশ পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু একটি বিষয় কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে আফজলের দণ্ডকে লঘু করিবার একটি সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। তাহারা কাজে লাগাইতেছে আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে। এই শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা নারীর মাতৃভাবনাকে আবেগাশ্রিত করিবার প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছে। তাহাদের মতে, শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল নাকি মৃত্যু দণ্ডাদেশের বিরোধী। ইতিমধ্যে নাকি তিনি বেশ কিছু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তের দণ্ড লঘু করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের জানা উচিৎ সরকারী কর্তব্যে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে মূল্য দেওয়া অনুচিৎ, তাহা নিশ্চিত মাননীয়া রাষ্ট্রপতি জানেন। শ্রীমতী প্যাটেল নিশ্চিত রাষ্ট্রের স্বার্থকে ব্যক্তিগত অপছন্দের যূপকাষ্ঠে বলি দিবেন না।

তবে এইটুকু বলা যায়, ভারতের জল, বায়ু, ধন-ধান্যে পালিত কিছু বুদ্ধিজীবী এখনও পাকিস্তানপ্রেমে ডগমগ হইয়া আছেন। কোনও সুযোগ বা অজুহাত উপস্থিত হইলেই এই সকল পাকিস্তানপ্রেমীগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে তৎপর হইয়া উঠেন। মুসলিম ভোটপিয়াসী দুর্বল শাসক দলগুলি ইহাদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না বলিয়াই ইহারা আজ অক্ষত।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী তাঁরাও সর্বমানবের মুক্তিদান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এশিয়ার মরু বালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুখ হয়েছে, সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রী-দূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণ সাধনার প্রাচীন বার্তা, আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম সেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধ মূর্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করছে। রাত্রে দেখি পূর্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিদ্রুমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপ মোচনের প্রার্থনা করছে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশেষজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনও নিঃশেষে রিক্ত হয়? —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠুক জাতি

এম ভি কামাথ

সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যা লক্ষণীয়। সুইডেনের রাজদূত মহামান্য মি. লারা ওলেফ লিণ্ডজেন সম্প্রতি আর এস এস প্রধান শ্রীমোহন ভাগবতকে মধ্যাহ্নভোজে আহ্বান করেছিলেন দিল্লির ইউরোপিয়ান হেড অব মিশনে ভাষণ দেবার জন্য। মজার ব্যাপার হলো, একটি দেশ ছাড়া সংযুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলির সাতাশটি সদস্য দেশ ওই সভায় অংশ নিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর এস এস সম্পর্কে কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়ছে।

এই ভোজসভা দু-ঘণ্টা দীর্ঘায়িত হয়েছিল এবং আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় যেমন আর এস এসের গণবেশ থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসসহ পরিবেশ রক্ষা, ইন্দো-পশ্চিম সম্পর্কের মতো বিষয়গুলি চর্চায় স্থান পেয়েছিল। এইসব সওয়াল তাদেরই নিজস্ব এবং শ্রীভাগবতকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা ছিল উদ্দেশ্য, তারা সেটাই করেছে।

আর এস এসের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কি? হিন্দুত্বের তত্ত্বে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের অবস্থান কোথায়? বাবরি মসজিদ ধ্বংসে কে বা কারা দায়ী? রাম জন্মভূমি আন্দোলন কি কোনও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা? 'হিন্দু সন্ত্রাস' কি?

এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন সত্ত্বেও সেই সভা বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ও মনোরম পরিবেশে শেষ হয়েছিল। 'হিন্দু সন্ত্রাসের' তত্ত্বকে তিনি সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বলেন যে, এই দুই শব্দ পরস্পরবিরোধী এবং আর এস এস কখনও ওই হিংসাকে বরদাস্ত করে না। আর এস এস যে কোনও আধাসামরিক সংগঠন নয় তা তিনি উড়িয়ে দিয়ে বলেন যে, শাখায় শাখায় যে শারীরিক কার্যক্রম করা হয় তা কেবল শরীর গঠনের লক্ষ্যে যা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগাভ্যাস ক্লাসে শেখানো হয়।

শ্রীভাগবত তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত, অভিজাত শ্রোতাদের জানিয়ে দিলেন যে, " 'হিন্দু' কথাটি কোনও ধর্মীয় সংকীর্ণ অর্থে-ব্যবহার না করে বরং একে আখ্যা দেওয়া উচিত এক গুচ্ছ মূল্যবোধ হিসাবে। যেমন বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দেওয়া, শান্তি পূর্ণ সহবস্থান, প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতাস্থাপন করে জীবনকে সাত্ত্বিক মার্গে (শুভবুদ্ধির পথে) পরিচালিত করা।" গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গত দু' হাজার বছর ধরে ভারতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্ব স্ব স্বাধীনতাকে। তিনি তাঁর শ্রোতাদের আরও জানালেন এদেশে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার কেউ কেউ করছে।

রামজন্মভূমি ইস্যু নিয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন যে, "মানুষই রামজন্মভূমি আন্দোলনের উদ্গাতা, সঙ্ঘ কেবল এই অন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সঙ্ঘ দায়ও স্বীকার করছে এবং যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি তা বিচারবিভাগীয় হোক বা অন্য কিছু তা মোকাবিলায় সঙ্ঘ পুরোপুরি প্রস্তুত।" তিনি সাহসের সঙ্গে পুনরায় বললেন যে, রামজন্মভূমি আন্দোলন কোনও ধর্মের বিরোধিতায় নয় বরং এই আন্দোলন ভারতীয় জাতির সামগ্রিক অস্মিতা, সম্মান ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

এই প্রথম কোনও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি আর এস এসের কোনও নেতৃস্থানীয় পদাধিকারীকে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি প্রশ্ন করল। হয়ত মুসলিম দেশগুলির রাজদূত বা কোনও সংগঠন ভবিষ্যতে এমন আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারে। এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে ই ইউ দেশগুলির সদস্যরা সব বিষয়ে সহমত, কিন্তু এটা তো সত্য যে, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এরকম এক নেতার এই প্রথম সাক্ষাৎকার নিল এমন ঘটা করে।

"মানুষই রামজন্মভূমি আন্দোলনের উদ্গাতা, সঙ্ঘ কেবল এই অন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সঙ্ঘ দায়ও স্বীকার করছে এবং যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি তা বিচারবিভাগীয় হোক বা অন্য কিছু তা মোকাবিলায় সঙ্ঘ পুরোপুরি প্রস্তুত।" তিনি সাহসের সঙ্গে পুনরায় বললেন যে, রামজন্মভূমি আন্দোলন কোনও ধর্মের বিরোধিতায় নয় বরং এই আন্দোলন ভারতীয় জাতির সামগ্রিক অস্মিতা, সম্মান ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

এই সাক্ষাৎকার একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিল যে, বিদেশীরা কীভাবে ভারতকে দেখে। এর আগে কি কখনও ভারতের বাইরের মিডিয়া র‍্যাডারে এমনভাবে ধরা দিয়েছিল। ভারত সরকার এর জবাব কীভাবে দিল? সম্প্রতি সংসদে কি কেউ এসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছে? রাজনৈতিক সামাজিক সংস্কৃতি জগত নিয়ে তত্ত্বাদি নিয়ে কেউ কি কখনও ইউরোপীয় মিডিয়ায় উত্থাপন করেছে? এগুলি কি করা উচিত ছিল না?

সমস্যা হলো ভারতীয় দূতাবাসগুলি বিদেশে কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে মনে হয় কেউই তেমন চিন্তিত নয়। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভারতীয় মিডিয়ায় দেশের কুড়িটি রাজ্য কি করছে তা সর্বদা তুলে ধরে না। আমরা বুঝতে পারি যে, বিদেশে ভারতকে তুলে ধরার এরকম কোনও প্রচেষ্টা সংসদীয় বৃত্তের মধ্যেও নেই। উদাহরণ হিসেবে গোধরা পরবর্তী গুজরাট দাঙ্গার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গোধরা পরবর্তী গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে আজও মিডিয়া সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে আবেগকে। গুজরাট দাঙ্গার কথা লোকে জানলেও কজন জানে যে, সেখানকার মুসলমানরা দেশের অন্য প্রান্তের মুসলমানদের থেকে অনেক অনেক গুণ ভাল অবস্থায় আছে? নরেন্দ্র মোদীকে অপদস্থ করা হয়েছে, অপদস্থ করাটাই যেন আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিরাট এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৬ সালের ভারত সরকারের নিয়োজিত সাচার কমিটির রিপোর্ট-ই একথা বলছে। সাক্ষরতার হারই ধরা যাক। সারা দেশে সাক্ষরতার গড়পড়তা হার যেখানে ৬৮.৮ শতাংশ, গুজরাটের সেই হার ৬৯.১ শতাংশ। গুজরাটের মুসলিম সাক্ষরতা ৭৩.৯ শতাংশ। সরকারী উচ্চপদে আসীন মুসলিমদের শতকরা হার গুজরাটে হলো ৮.৫ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে সেই হার মাত্র ১.২ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৬.২ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে তা ৩.২ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রে ১.৯ শতাংশ।

সমস্যাটা দানা বাঁধছে তখনই যখন অনেকেই এই রিপোর্ট পড়ে না এবং তা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় না। সত্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের মিডিয়া যখন অপারগ, তখন বিদেশীরা ভারতের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিরূপ মনোভাব নিতেই পারে, এতে অপরাধটা কোথায়? দূতাবাসের লোকজন দুষ্ট চরিত্রের এবং এরা তথাকথিত বিদ্বৎজনদের আহ্বান করে তাদের স্বাধীনতাকে জাহির করে, অন্য দেশের কাছে নিজেদেরকে অপদস্থ করতে এরা কুণ্ঠিতও নয়। আমাদের জয়রাম রমেশ চীনে গিয়ে কী করলেন? কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, রমেশের মতো এক ব্যক্তি তাঁর সহকর্মীকে নির্দ্বিধায় অপদস্থ করতে পারে বিদেশের মাটিতে? কিন্তু সেটাও আমরা লক্ষ্য করলাম। এর দ্বারা এক অদ্ভুত ভারতীয় মানসিকতায় পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ভারতীয় কেবল একজন তার্কিক-ই নন, অপরের সমালোচনারও খোরাক। আমাদের দেশের এমন বুদ্ধি জীবীদের আত্মসমালোচনা করা উচিত। শ্রীভাগবত অনেক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও সঠিক জবাব দিয়েছেন। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলির রাজদূতেরা যদি রমেশকে এমন এক প্রশ্নোত্তর সভায় আহ্বান জানাতো তবে কি রমেশ এমন বলিষ্ঠ উত্তর দিতে পারতেন? তিনি হিন্দুত্বের বিরোধিতা বা নিন্দা করতেন, বলতেন ভারতকে বিশ্বাস করা যায় না এবং সরকার এদেশে দুর্নীতিপরায়ণ। রমেশকে নিয়ে ভাবুন। এবং এরপর যদি কোনও সভাতে রমেশকে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়, তবে দয়া করে সেই সাম্মানিক পদটি ছাড়ুন। আপনি গাউন পরিধানেরও যোগ্য নন। সোনিয়াজী দয়া করে জয়রাম রমেশ, শশী থারুরের মতো ব্যক্তিদের সংশ্রব ত্যাগ করুন। আমরা ওঁদের ছাড়াই বেশ চলতে পারব।

ই ইউ রাজদূতেরা নতুন দিল্লিতে আর এস এস প্রধানের সঙ্গে এক চর্চায় বসেছিলেন এবং এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁদের কী বলেন এই মহান দেশ ও তার মূল্যবোধ সম্পর্কে—সেটা জানাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

[লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক। দিল্লীর সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার'-এর সৌজন্যে]

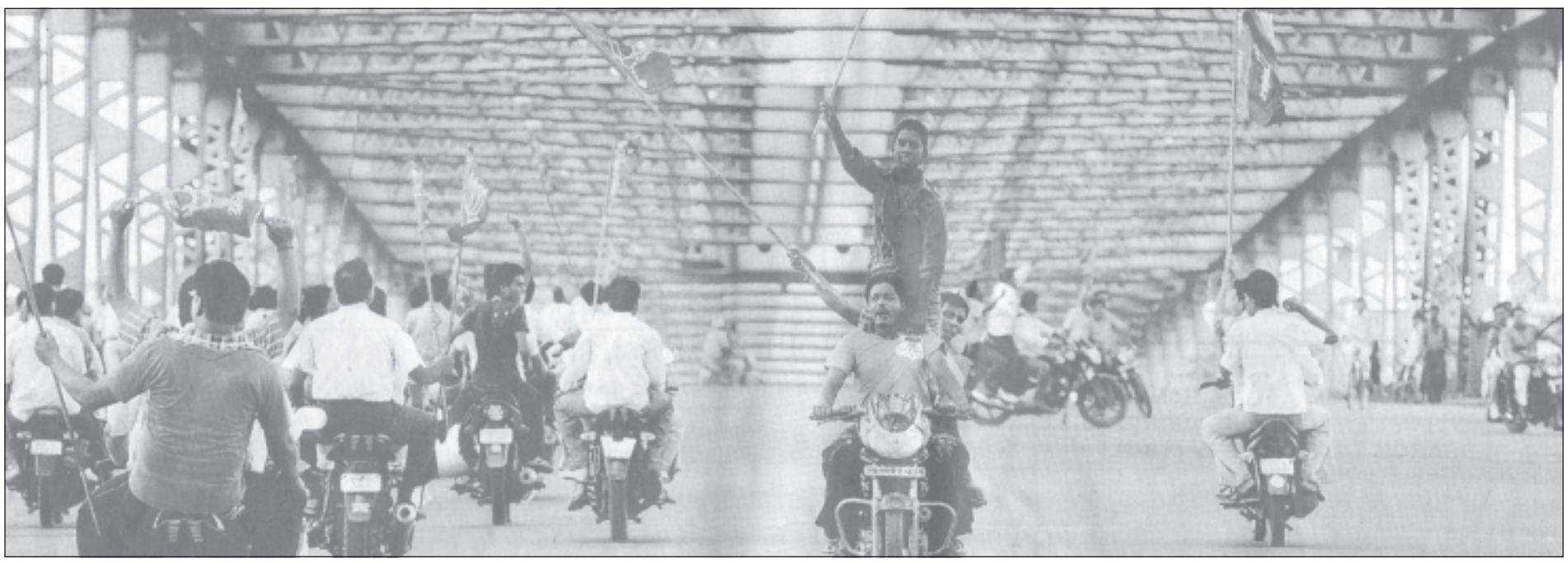

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলির ডাকা নজিরবিহীন স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক ভারত বন্‌ধ-এ হাওড়া সেতুর একটি দৃশ্য। সৌজন্যে — দি টেলিগ্রাফ।

প্রার্থী হতে নারাজ বুদ্ধ

(১ পাতার পর)

কথায়, দলের রাজ্য কমিটির সদস্যরা বুদ্ধবাবুর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার প্রতি তাঁদের অনাস্থা জানান। বৈঠকে উপস্থিত বিমানবাবু সমালোচনার ঝড় বন্ধ করার কোনও চেষ্টাই করেননি। বৈঠকে তাঁর নীরবতাকে সমালোচকদের প্রতি সমর্থন বলেই মনে করছেন বুদ্ধবাবু। দলের ভিতরে দ্বিতীয় ধাক্কাটি এসেছে ৪ জুলাই দিল্লীতে পলিটব্যুরোর বৈঠকে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে দলের নির্বাচনী ব্যর্থতার প্রসঙ্গে প্রকাশ কারাটের সঙ্গে বুদ্ধবাবুর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় রাজ্যের প্রতিনিধি নেতারা নীরব ছিলেন। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ছেড়ে উঠে গেলেও রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টাই করেননি। বুদ্ধবাবু বুঝে যান দলের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ। বিধানসভার নির্বাচনে হার হলে তাঁকেই বলির পাঁঠা করবে কারাত এণ্ড কোং। তাই পলায়নই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করছেন বুদ্ধবাবু।

একদা 'পুরানো মুখ' জ্যোতি বসুকে সরিয়ে 'নতুন মুখ' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নেতৃত্বে এনে বড় সাফল্য পেয়েছিল সিপিএম। আবার পার্টির ভিতর থেকে দাবি উঠেছে পুরানো মুখ সরিয়ে দেওয়ার। বলা হচ্ছে যে শিল্পায়নের স্লোগান দিয়ে কৃষি জমি অধিগ্রহণের প্রবক্তাদের উপর স্পষ্ট অনাস্থা জানিয়েছেন রাজ্যের ভোটদাতারা। এই প্রবক্তারা দলের নেতৃত্বে থাকলে নির্বাচনে ভরাডুবি হবে। দলের স্বার্থেই এই নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ, ব্যক্তির থেকে দল বড়। বলাবাহুল্য যে শিল্পায়নের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে বুদ্ধবাবু এবং নিরুপম সেন আছেন।

ভারতের 'ভিশন ডকুমেন্ট' চাই

(১ পাতার পর)

শক্তিমানের কথা শোনে, দুর্বলের কথায় কেউ পাত্তা দেয় না। এখন উপযুক্ত সময় হলো দেশকে শক্তিশালী করে দেশের সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করা।

শ্রীভাগবত উগ্রপন্থীদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফেরানোর প্রসঙ্গে বলেন, ওইসব দেশবিরোধীদের পুনর্বাসনের পরিবর্তে উদ্বাস্তু পণ্ডিতদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে নেওয়াটা বেশি জরুরি। অথচ সে বিষয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কুড়ি বছরের বেশি উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছেন। তাদেরকে কাশ্মীরে ফিরতে বলা হলেও তাদেরকে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অবাধে স্বধর্ম পালনের কোনও ব্যবস্থাই ভারত সরকার করে উঠতে পারছেন না।

ওই অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এস কে সিন্‌হা বলেন, পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধে কাশ্মীর দখল করতে পারেনি। এখন সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে প্রক্সি ওয়ার (ছায়াযুদ্ধ) চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, শ্রীসিন্‌হা ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারতের সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং সেনা অফিসার এবং রাজ্যপাল হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরে কুড়ি বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন। তিনি বলেন ৬১ শতাংশ কাশ্মীরবাসীই ভারতের স্বপক্ষে, তাদেরকে সবরকম সহায়তা করা উচিৎ। বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি বলেন, ভারত আমেরিকার চাপে কাশ্মীর-পলিসি ঠিক করে, এজন্য পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বইয়ের লেখক ছাড়াও প্রবীণ আর এস এস নেতা বাবুরাও বৈদ্য, প্রকাশক উল্লাস লাটকরে, ডঃ অবতারকৃষ্ণ গুঞ্জ, মনোহর সিন্ধে, প্রভাকর রাও মণ্ডলে, প্রাক্তন সাংসদ বনোয়ারীলাল পুরোহিত এবং বিজেপি নেতা কিরীট সোমাইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী

(১ পাতার পর)

বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যে শ্যামাপ্রসাদের জন্য আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছি তাঁর জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করাটা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। শেষে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির পক্ষে সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ইসরত জাহান লস্কর-এ-তৈবার ফিদাইন হু হেডলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০০৪ সালের ১৫ জুন গুজরাট পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত মুম্বাই-এর ছাত্রী ইসরত জাহান 'লস্কর এ তৈবা'র আত্মঘাতী বাহিনীর সদস্য ছিল। এবার এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে নিল আমেরিকায় ধৃত এবং বন্দী তথা মুম্বাই হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী আমেরিকান মুসলিম ও শীর্ষ আল কায়েদা জঙ্গি ডেভিড কোলম্যান হেডলি। উল্লেখ্য, তখন এই 'এনকাউন্টার'কে সাজানো ঘটনা বলে গুজরাট পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড়করানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেকনজরে থাকার জন্যেই গুজরাট পুলিশ এই কাজ করেছে বলে কংগ্রেসসহ কয়েকটি মানবতাবাদী সংগঠন অভিযোগ করেছিল। গুজরাট বিজেপি সভাপতি ও আর সি ফালডু (Faldu) জানিয়েছেন যে তারাও ওই একই কথা বরাবর বলে আসছিলেন যা হেডলি আজ বলেছে।

প্রসঙ্গত, হেডলি মূলত পাকিস্তানী। আমেরিকা প্রবাসী। সে আমেরিকায় ধরা পড়ার পরে ভারতে ২৬।১১ হামলায় যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছিল। তখন ভারতীয় গোয়েন্দারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। শুরু হয় কূটনৈতিক তৎপরতা। আমেরিকার বদান্যতা এবং ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির ফলে নবগঠিত জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এন আই এ-এর অফিসাররা আমেরিকায় গিয়ে হেডলিকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ পান।

ইসরত জাহান ফিদাইন (আত্মঘাতী) বাহিনীর সদস্য ছিল বলে ভারতীয় গোয়েন্দাদের জেরার মুখে কবুল করেছে কোলম্যান হেডলি। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, হেডলি ন্যাশন্যাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির গোয়েন্দাদের আরও জানিয়েছে, 'ইসরতকে নিয়োগ করেছিল লস্কর এ তৈবা'র শীর্ষনেতা মুজাম্মিল। মুজাম্মিলই ২০০৭ পর্যন্ত ভারতে লস্করের প্রধান হিসেবে কাজ করত। হেডলি যে তথ্য দিয়েছে তার সঙ্গে গুজরাট পুলিশ ও কেন্দ্রের বক্তব্য হুবহু মিলে গিয়েছে। এছাড়াও হেডলির স্বীকারোক্তিকে লস্করের বিরুদ্ধে ভারতে সন্ত্রাস পাচারের প্রামাণ্য নথি হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মুম্বাইয়ের গুরু নানক খালসা কলেজের ছাত্রী ইসরাত জাহান ২০০৪-এর ১২ জুন আচমকা মুম্বাই থেকে নিখোঁজ হয়। তিনদিন তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। পরে খবর আসে আমেদাবাদে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে ইসরাত জাহান ও তার তিন সঙ্গী জাভেদ গুলাম শেখ ওরফে প্রাণেশ পিল্লাই, আমজাদ আলি ও জিশান জোহর আবদুল গণি। আমজাদ ও জিশান পাকিস্তানী নাগরিক। পুলিশ জানিয়েছিল, নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার জন্য লস্কর-এর ফিদাইন সদস্যরা পাকিস্তান থেকে আমেদাবাদে এসেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গুজরাট পুলিশ তাঁদের নীল রং-এর গাড়িটিকে ধাওয়া করে। সেই এনকাউন্টারে নেতৃত্ব দেন দুজন পুলিশ অফিসার— সোহরাবউদ্দিন এবং এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট ডি সি ধনঞ্জয় বানজারা।

এরপর ইসরাতকে নির্দোষ বলে একদল গুজরাট পুলিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোর্টে মামলা হয়। ধনঞ্জয় বানজারা এখনও জেলে। প্রশ্ন উঠছে— এবার কি হবে? ইসরাতের মৃত্যুর পর মুম্বাইয়ে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল হয়েছিল। ওদিকে লস্কর এ তৈবা'র লাহোরের মুখপত্র 'খাজওয়া টাইমসে' তাকে দলীয় সদস্য হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিক

(১ পাতার পর)

হলো কেন্দ্র সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের কয়েক কোটি পিছিয়ে পড়া তপশীলি জাতি-জনজাতি (হিন্দু)-দের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ প্রদান করে আসছে। আইনে সংশোধন করে অত্যন্ত সুকৌশলে বিভিন্ন মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে পিছিয়ে পড়া হিসেবে নথিভুক্ত করে এরাজ্যের তপশীলি জাতি-জনজাতি এবং ওবিসি-দের প্রাপ্য বা ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার উপর অংশীদারিত্ব প্রদান বা ভাগ বসানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী নিজেই বিধানসভাকে জানিয়েছেন রাজ্যের ১ কোটির বেশি মুসলমান এই সুযোগের আওতায় আসবে। এদিকে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই সুযোগের ব্যবহারকারী মুসলিমদের সংখ্যাটা দু'কোটির কাছাকাছি হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে রাজ্য সরকার এরাজ্যের মুসলমানদের ধর্মের ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে দশ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সেটা ভারতীয় সংবিধানের মূল চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শের পরিপন্থী। এজন্যই রাজ্য সরকার সুচতুরভাবে রাজ্যের প্রচলিত 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস বিল ১৯৯৩'-এর সংশোধন করেছে। যা গত ১৪ জুন গেজেট নোটিফিকেশন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Bill No. 14 of 2010

The West Bengal Commission For Backward Classes (Amendment) Bill, 2010.

এই সংশোধন-এর ফলে রাজ্য সরকার কমিশনের কাছে যে সকল জাতিগোষ্ঠীকে পিছিয়ে পড়ার তকমা দেওয়ার জন্য পাঠাবে তাকে স্বীকৃতি দিতে কমিশন বাধ্য থাকবে। এভাবেই ওই আইনের ৯নং ধারার ১-এর এ, বি, এবং (২) ও (৩) নং ধারাকে সংশোধন করা হয়েছে।

(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে—"The Commission shall, on request from the state Government, examine the social and education conditions and problems incidental thereto of any class of citizens belonging to the backward classes within the territory of West Bengal, and advice the State Government."

যে কারণে এই সংশোধন, যা একরকম প্রত্যাশিত ছিল তা ঘটে গিয়েছে গত ২ জুলাই হাইকোর্টের এক রায়ে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিক। এটাও পিছনের দরজা দিয়ে পাস করাতে কে এম ডি এ ২রা জুলাই রায়দানের দিনই আদালতে একটি সংশোধনী পেশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে— অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের সংখ্যালঘু হিসাবে গণ্য করে, তাদের জন্য ২৬ শতাংশ ফ্ল্যাট সংরক্ষিত রাখা হবে।

এদিকে চাকরিতে সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ যেহেতু করা হয়নি তাই সেখানে কোনও প্রভাব পড়বে না।

রাজ্য রাজনীতি

বামফ্রন্ট শরিকদেরও খেয়োখেয়ির নির্লজ্জ বেহায়াপনা

নিশাকর সোম

বামফ্রন্ট সরকারের বিদায় যতই এগিয়ে আসছে ততই বামফ্রন্টের দলগুলির ওপরের চাকচিক্য ধুয়ে গিয়ে খড়ের গাদন বেরিয়ে পড়ছে। বামফ্রন্টের প্রতিটি দলে পারস্পরিক খেয়োখেয়ি চলছে। এই খেয়োখেয়ির কারণ হলো তিনদশক ধরে ফ্রন্ট-এর বিভিন্ন দলের মন্ত্রী-নেতা-নেত্রীদের 'লুঠলে হালুয়া' নীতির ফলে স্ফীত হওয়ার পাশাপাশি নিচের তলার 'বঞ্চি ত' কর্মীরা না-পাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভের মাত্রা বিদ্রোহের আকার নিতে চলেছে। নির্লজ্জতার বেহায়াপনার এক চমৎকার প্রদর্শনী বামদলগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এবং আরও যাবে। পার্টি ফোঁপরা ঢেঁকিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক— আর-এস-পি— বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টির মধ্যে খেয়োখেয়ির চিত্রটা। আর এস পি-এর ঘোষিত লক্ষ্য— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এস পি স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লব-কে 'হাফ ম্যাড, হাফ ড্রাঙ্ক রেভিলিউশন' বলে অভিহিত করেছে। কমিউনিস্টদের বরাবর আর এস পি সংশোধনবাদী ও পুঁজিবাদীর লেজুড় বলে থাকতো। তিন দশক এই লেজুড়দের সঙ্গে থেকে গুছিয়ে নিয়েছে। আদিকাল থেকেই আর এস পি দল-এ ভাঙন চলেছে। প্রথম ভাঙন আর এস পি ভেঙে এস ইউ সি দল তৈরি। আর এস পি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চ্যাটার্জি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং রাজ্যসভার সদস্য হন। কেরলে আর এস পি-র ক্ষীণতম বপু। পশ্চিমবঙ্গে একদিকে দলের শ্রমিক নেতা (যদিও দলের কোনও শ্রমিক ইউনিয়ন নেই) অশোক ঘোষ এক বাংলা দৈনিকে বামফ্রন্টের শ্রাদ্ধ করেছেন। অপর দিকে কৃষক নেতা অশোক চৌধুরী দাবি করে এসেছিলেন—"ক্ষিতির শুধু সমালোচনা করলেই হবে না, মন্ত্রিত্বও ছাড়তে হবে।" হা হতোস্মি! লাভের খনির বখরা ছাড়বে কেন? আর এস পি-এর বিদ্রোহী নেতাদের তোড়ের মুখে তিন মন্ত্রীই পড়েছেন। সমালোচনা উঠেছে— ক্ষিতিবাবুর পত্নী পার্টি-সংগঠনে হস্তক্ষেপ করছে। পার্টির বহু নেতাকর্মী পদত্যাগ করতে চান। এই পার্টি মানুষের ভাল

ক্ষিতি গোস্বামী

কোনওদিনই করতে পারবে না। ক্ষিতিবাবু তো প্রকাশ্যে তৃণমূল নেত্রীর প্রশংসা করেছেন!

আর এস পি-এর রাজ্য-সম্পাদক প্রাক্তন মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জি অসুস্থ অশক্ত। পার্টিটা আর কোনও দিনও সংগঠিত হতে পারবে বলে মনে হয় না।

বামফ্রন্টের আর একটি দল ফরওয়ার্ড ব্লক। এ-দলেও ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠেছে। রাজ্য-সভাতে যাওয়া নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস-বরুণ মুখার্জির কেচ্ছা সংবাদপত্রে প্রকাশিত। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ মমতাকে 'আমাদের নেত্রী' বলেছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে দলের খাদ্য-সমবায় মন্ত্রীদের দুর্নীতি নিয়ে সরব সমালোচনা

অশোক ঘোষ

উঠেছে। একদা ফরওয়ার্ড ব্লক ভেঙে অমর বসু, রাম চ্যাটার্জি, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি (কালুদা) মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেছিলেন। এই ভাঙনের কারণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁকে ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থন করে। কমিউনিস্টরা বিরোধিতা করে— কমিউনিস্টদের সঙ্গে থাকার জন্য মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করা হয়। পরে ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করার পর তাদের এক সাংসদ বিনয়কৃষ্ণ দাশ চৌধুরী কংগ্রেসে যান। এছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লকের একাধিক নেতা-সাধারণ সম্পাদক সমেত কংগ্রেসে চলে যান এবং রাজ্যসভায় স্থান লাভ করে। ফরওয়ার্ড ব্লকও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং নেতাজীর-ভক্ত। এহেন ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেতা বউবাজার বোমা বিস্ফোরণে শাস্তিপ্রাপ্ত রসিদের হোটেল-শাহি দরবারের উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে রোল বিতরণের ঘটনা দেখেছিলাম। তিন দশকের মধ্যে হেমন্ত বসু, অজিত বিশ্বাস, নেপাল রায় হত্যার রহস্য উদঘাটনে ফরওয়ার্ড ব্লক চুপচাপ থেকে গেল কেন? অদূর-ভবিষ্যতে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিলীন হওয়া অসম্ভব নয়। এই ধরনের দল কি দেশের-দশের মঙ্গল করতে পারে? এই দলের নেতারা নীতিহীন,

এ বি বর্ধন

আদর্শভ্রষ্ট, লোভ-লালসায় মত্ত।

বামফ্রন্টের আর এক শরিক সিপিআই। এরা তিনদশক ধরে বহু সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে। মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে অহঙ্কারী বুদ্ধ দেব প্রবীণ সিপিআই নেতা নন্দ ভট্টাচার্যকে অপমান করার পরই নন্দবাবু ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এবং সুভাষ চক্রবর্তীকে নিয়ে বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে ছক কষেছিলেন। এটা আসলে সুভাষ চক্রবর্তী বলেছিলেন। সিপিআই-এর সাধারণ-সম্পাদক এ বি বর্ধন সিপিএম-কে সমালোচনা করলেও সিপিএম-কে ছাড়তে চাইবেন না। এদিকে রাজ্যে সিপিআই-এর নিচের তলার কর্মীরা সিপিএম-কে টাইট দেবার জন্য উদগ্রীব। স্মরণ করা দরকার সিপিআই একসময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল। আজ তারা কংগ্রেস বিরোধী এবং সিপিএমের একাংশ সোনিয়ার আঁচলের তলায় যাবার জন্য ব্যস্ত। এ-রাজ্যে বস্তুত সিপিআই একেবারে ক্ষীণতর দলে পরিণত হয়েছে। এ-দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে, ক্ষমতার রস পেয়েছে এইদল। গুরুদাস দাশগুপ্ত আগামী দিনে দলের নিয়ন্ত্রক হবেন। এই দোদুল্যমান দল কি দেশের-দশের মঙ্গল করবে, না নিজেদের মঙ্গল খুঁজবে? লোভ-অহঙ্কার এই দলের নেতাদের মধ্যে আছে— এটা তাদের নেতা বর্ধন স্বীকার করেছেন। রাজ্যের বামফ্রন্টের নেতা সিপিএম। সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের বৃহদংশ সোনিয়ার আঁচল ধরার পক্ষপাতী। দলের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি-প্রমোটার-পোষণ-ম্যানি-মাসলম্যানদের আধিক্য। ফলে নির্বাচনী বিপর্যয় অব্যাহত। এই দলও তাদের ঘোষিত কর্মসূচিকে চোতা কাগজে পরিণত করে নির্বাচনকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছে।

আগামী বিধানসভায় এঁরা এক ক্ষীণ বিরোধী দলে পরিণত হবে।

দলের রাজ্য-নেতৃত্বের একাংশ যথা— গৌতম দেব-নিরুপম, তথা বর্ধমান গোষ্ঠী বুদ্ধ-বিমানের নেতৃত্ব মানতে রাজি নয়। চলছে লড়াই। এর ফয়সালা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হবে। এই দলও কৃষক-শ্রমিক-গরিব মানুষকে মেরে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতির পদসেবায় লালায়িত। সিপিএম-কে হঠিয়ে যে দল অর্থাৎ তৃণমূল আসবে বলে মনে করা হচ্ছে, তারা ক্ষমতায় আসার আগেই ওই দলে কিছু কিছু লোভ-লালসা-দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে।

এ ঘটনা আরও বাড়বে। এ দলের কোনও আদর্শ নেই, খালি রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার জন্য মারি অরি পারি যে কৌশলে—এই তাদের নীতি।

অফ রকম

....ভিক্ষা নিতে যাই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই। তখন যাহা পাই, সে যে আমি হারাই বারেবারে। তিনি যখন আসেনো আমারো দ্বারে। বন্ধ তালা, খুলে দেখি আপন মাঝে গোপন রতন হার।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপন রতন হারের সন্ধান পেল জনা এগারো হত-দরিদ্র কানে কম শোনা, কথা বলতে না পারা মেয়ে। খিঞ্জিবী প্রজাপতির মাঝেই এহেন সন্ধান মিলল। খিঞ্জিবী প্রজাপতি পেশায় ভিখিরী। নিজে ভিখিরী কিন্তু অন্যদের ভিক্ষে দিচ্ছেন। অসম্ভব না হলেও, এহেন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। প্রজাপতি গত ২৬ জুন প্রমাণ করে দিলেন দাতব্য করতে গেলে টাকার দরকার নিশ্চ য়ই আছে তবে তার চেয়েও দরকার একটা নিষ্পাপ মনের। যে উদারমনস্কতাই হয়তো প্রায় বোবা-কালা ১১টি মেয়ের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের পরণের কাপড়। ভিক্ষের টাকায় তিল তিল করে জমানো তিন হাজার টাকার বিনিময়ে খিঞ্জিবী কিনেছে সেইসব কাপড়-চোপড়।

গত একযুগ ধরে কলির এই দাতাকর্ণটি থাকছেন আমেদাবাদের মেহসানা অঞ্চ লে অবস্থিত সিমানধার স্বামী জৈন মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এটিই তার ভিক্ষার মূল স্থান। এর পাশাপাশি হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকাতেও ভিক্ষে করে দিন কাটে তার। তবে একজন সাধারণ ভিখিরীর সঙ্গে খিঞ্জিবী প্রজাপতির কোনও তুলনাই চলে না। পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে খালি নিজের জন্যই টাকা

ভিখিরী উদ্যোগপতি খিঞ্জিবী প্রজাপতি।

ভিক্ষে করেন না তিনি। শ্রীপ্রজাপতির বক্তব্য— "আমার দিনে দু'বেলা খাওয়াই যথেষ্ট। আমার স্ত্রী থাকেন রাজকোটে। আলসার এবং লাংস ইনফেকশনে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। তার আরোগ্যের জন্য আমায় কিছু টাকা ওখানে (রাজকোটে) পাঠাতেই হয়। এইটুকু ছাড়া ভিক্ষে করে আমার যা উপার্জন হয় তা দিয়ে দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য আমি খাবার কিনি।" আর এই মেয়েগুলোকে জামা দান করে তাঁর মন্তব্য— "দীর্ঘদিন ধরে মেয়েদের ব্যাপারে আমার কিছু করার ইচ্ছে একটা ছিলই এবং এতদিন পরে তা করতে পেরে আমি আজ খুব খুশী।"

স্বাতী ভগবানদাস হলো ১৮ বছরের এক অনাথ বালিকা। অনেক শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মেয়েটি বোধহয় তার বাবা-কে খুঁজে পেয়েছে। যে বাবার কাছ থেকে সে স্নেহের পরশ মাখানো একটা জামা উপহার পেয়েছে। তার আরও দশটা বোনও সেই একই উপহারের পাওনাদার। 'বাবা'টি বলা বাহুল্য খিঞ্জিবী প্রজাপতি। তাই তাদের চোখে-মুখে ঝড়ে পড়ছে একইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা আর খুশি।

তবে স্বেচ্ছায় ভিক্ষা-কে পেশা হিসেবে বেছে নেননি প্রজাপতি। রাজকোটে চায়ের দোকান দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রথমত দামে না পোষানোয়, দ্বিতীয়ত, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ায় সে আশা ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেন ভগবানই তাঁকে মেহসানায় টেনে এনেছে। সিমানধর স্বামী জৈন মন্দিরের অছি পর্যদের সদস্য ভরত শাহের মন্তব্য— "আমার ৩৫ বছরের জীবনে এই ধরনের উদ্যোগপতি আমি কখনও দেখিনি।"

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

—সঃ স্বঃ

অসমে স্থায়ী বাংলাদেশী বসতি — ইসলামনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দক্ষিণ ভারতে হয়েছিল মীনাক্ষীপুরম্ থেকে রহমৎনগর। আর উত্তরপূর্ব ভারতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ইসলামনগর। ঘটনাটি ঘটেছে অসমে। আর এই জবরদখল যারা করছে তারা হলো বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। অসমের সংরক্ষিত বনাঞ্চ ল সহ বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো জবরদখল করে বাংলাদেশী মুসলমানদের কলোনী গড়ে উঠছে। আর অসমের মূল নিবাসীরা নিজভূমে ক্রমশ জমিহারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এখন নগাঁও-এ যে অবস্থা তা অন্যান্য জেলাতেও অদূর ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের এব্যাপারে আদৌ কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন বাংলাদেশীদের কাজিরাঙা অভয়ারণ্য এবং ওরাং ন্যাশন্যাল পার্কে ঘাঁটি গেড়ে বসার খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় শিরোনামে এসেছে। পরে হলেও খবর বের হয়েছে— বরবিল ও বড়পাথর সংরক্ষিত বনাঞ্চ লে বাংলাদেশীরা বসতি স্থাপন করেছে। বিগত চার/পাঁচ বছর ধরে নগাঁও জেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় এই ঘটনা ঘটে চলেছে। বনবিভাগের কাছেও এখবর অজানা নয়। সব থেকে আশ্চর্যজনক হলো, রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী রকিবুল হুসেনের নিজের জেলাতে এই ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশীরা যা খুশী করছে, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। অথচ রাজের সংরক্ষিত বনাঞ্চ লকে বাংলাদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব বনমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন না। এক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত প্রীতি কাজ করছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি কখনও রাহা বিধানসভা কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতেন তাহলেই তিনি প্রত্যক্ষ করতেন কিভাবে সন্দেহভাজন বাংলাদেশীরা অসমের সংরক্ষিত বনাঞ্চ ল দখল করে জাঁকিয়ে বসেছে। এক পা এক পা করে ধীরে ধীরে সংরক্ষিত বনভূমি গ্রাস করছে বাংলাদেশীরা। অথচ এদেরকে রক্ষা করতেই কংগ্রেস ১৯৮৩ সালে অধুনা অকার্যকর 'আই এম ডি টি' নামক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে এবং জনগণকে জানান দিয়েছিল। নির্বাচনে এদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী বছরেই অসম বিধানসভার নির্বাচন। সন্দেহভাজন বাংলাদেশীরা আবারও ব্যাপক সংখ্যায় নগাঁ জেলার বড়পাথর ও বরবিল সংরক্ষিত বনাঞ্চ লে আসতে শুরু করেছে। ব্যাপকহারে বনাঞ্চ ল কাটা হচ্ছে। কামপুর থেকে কচুয়া হয়ে বরবিল গেলেই দৃশ্যটা চোখে পড়বে। বড়পাথর থেকে কারবিআংলং জেলার গা ঘেঁসে দেখা যাবে কিভাবে জনবসতির ভারসাম্য বদলে গিয়েছে। এই জবরদখল-কারীরা কারা? কোথা থেকেই বা এরা এল? জেলা প্রশাসন এবং বনবিভাগ এ বিষয়ে অন্ধকারে থাকতে পারে না। অভিযোগ উঠছে, একশ্রেণীর রাজনীতি নেতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদীরাই এই সন্দেহভাজন বাংলাদেশীদেরকে নগাঁও জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চ লে বসতি স্থাপন করার পিছনে রয়েছে। বনবিভাগ রহস্যজনকভাবে নিশ্চুপ।

অবস্থা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে, ওই বাংলাদেশীরা ইতিমধ্যেই বিশাল বনাঞ্চ ল সাফ করে চাষ-আবাদ শুরু করে দিয়েছে। নগাঁও জেলার এরকম একটি বসতির নাম হয়েছে—ইসলামনগর। অসমের সীমান্তবর্তী (বাংলাদেশ) অঞ্চ লে বাংলাদেশীরা জবরদখল করে বসে পড়ছে, এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে অসম রাজ্যের মধ্যাঞ্চ লে নতুন নতুন গ্রাম অল্পদিনের মধ্যেই গজিয়ে উঠছে। এটাই চরম বিপদ সংকেত। মূল অসমবাসীদের আক্রমক মৌলবাদী এবং মিলিট্যান্টদের দয়ার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী সরকারী রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চ লকে সস্তা নির্বাচনী স্বার্থে বাংলাদেশীদের নিরাপদ বাসভূমি হিসেবে ছেড়ে দিচ্ছে স্থানীয় মূল অসমবাসীদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েই।

পরপর দুবার দু'দফায় তরুণ গগৈ-এর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে অসমের বিপুল পরিমাণ জমি দ্রুত অসম তথা ভারতের বিদ্বেষ ও শত্রুভাবাপন্ন বাংলাদেশীদের হাতে চলে গেছে। বার বার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এরকম সংবাদ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে। তাহলে কি মূল অসমবাসীরা অদূর ভবিষ্যতে জন্মভূমিতেই উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে চলেছে?

ইসলামনগরের একাংশ। ইনসেটে বনমন্ত্রী রকিবুল হোসেন।

পরলোকে গোপালভাই আসর

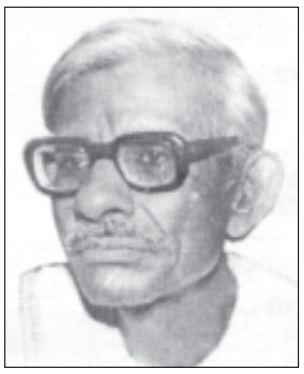

সংবাদদাতা॥ গত ২২ জুন সকালে কলকাতার ভবানীপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা গোপালভাই আসর পরলোকগমন করেন। তাঁর বাবার নাম দামোদরভাই আসর। গোপালভাই-এর জন্ম কলকাতায় ২০ নভেম্বর ১৯২৮-এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক গোপালভাই আজীবন অবিবাহিত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মোটর পার্টস-এর ব্যবসা ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা, অসম এবং ওড়িশায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজের অগ্রগতি হয়। ১৯৭৭-এ তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সদস্য হন।

এছাড়াও গোপালভাই অল ইণ্ডিয়া মোটর ডিলার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং কলকাতা মোটর পার্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতিও হয়েছিলেন। 'মানব সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর মাধ্যমে যেসব বিভিন্ন সেবাকাজ চলে, গোপালভাই সেই প্রতিষ্ঠানের অছি হিসেবে পরামর্শাদি দিয়ে গেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে পরিষদের কাজের বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুত, স্বর্গীয় সীতারাম আগরওয়াল, অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং তাঁর কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে পরিষদের কাজের প্রসার ঘটে এবং জনজাতি সমাজকে খৃস্ট মতে মতান্তরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আজও সেই কাজ অবাধ গতিতে চলছে। গত ২৬ জুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্তীয় কার্যালয়ে (৩৩ ভূপেন বোস এভিনিউ) তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়।

শোকসন্দেশ পাঠানোর ঠিকানা—শ্রীঅস্মিতভাই আসর, ৯-এ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০।

স্বর্গীয় গোপালভাই একজন প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগী ছিলেন।

মালদায় জাল নোট চক্রের মাফিয়া ধৃত

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা॥ মালদা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চ ল দিয়ে ক্রমাগত জাল নোট ও অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে এদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার চক্রান্ত করেছে আই এস আই-এর মদতে চলা বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলি। গত ২৩ ও ২৬ জুন এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ও ১২ লক্ষ টাকার জাল নোটসহ জাল নোটচক্রের পাণ্ডা বকুল মিঞা সহ আরও ৬ জনকে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ গত এক মাসে ৬০ লক্ষ টাকার জাল নোট ধরলেও ২৬ জুন একসঙ্গে ১২ লক্ষ টাকার জাল নোটসহ ৫ জনকে ধরা ইংরেজবাজার পুলিশের একটি বড় সাফল্য। ধৃত বকুল মিঞাকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত তিন মাসে সে তিন কোটিরও বেশি জাল টাকা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এনে ছড়িয়ে দিয়েছে। মূলতঃ বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের মাধ্যমেই এই জাল নোটগুলি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। গত ১৭ জুন মালদা টাউন স্টেশন থেকে ভিনরাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের ৫ জনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। নোটগুলি বেশির ভাগই ৫০০ টাকার। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুর, গোলাপগঞ্জ, বাখরপুর, সুজাপুর প্রভৃতি সীমান্ত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জাল নোট পাচার হচ্ছে। পুলিশ অনেকদিন থেকে পাচার চক্রের মূল পাণ্ডাকে খুঁজছিল, এদিন বকুল মিঞাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুললে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেন। মনে করা হচ্ছে তার কাছ থেকে গোপন তথ্য নিয়েই একসঙ্গে ১২ লক্ষ টাকার জাল নোট ইংরেজবাজার থানার গৌড়বঙ্গ স্টেশনের পাশে জাতীয় সড়ক থেকে আটক করেছে। পুলিশ সুপার ভুবন চন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, ধৃতরা হলো আনারুল হক, আলম শেখ, রাজীব শেখ ও ফিটু শেখ। এদের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম মোহনপুরে। নোটগুলি বাংলাদেশ থেকে এনে উত্তর ভারতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ছিল পাচারকারীরা, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

আগাম খবর পেয়ে পুলিশ ক্রেতা সেজে ১ লক্ষ টাকা পিছু ৩২ হাজার টাকার আসল নোট দেওয়ার টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলে এবং দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে। কলকাতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে একইসঙ্গে এত বড় অঙ্কের জাল টাকা সহ ধরা পড়ে গেল পাঁচ জন পাচারকারী। এদের মধ্যে পার্বতী বসাক নামে এক মহিলা পাচারকারীও আছে। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে সিটু

সংবাদদাতা ঃ মালদা॥ মালদা জেলার কালিয়াচক ৩নং ব্লকের বৈষ্ণবনগরের নিকটস্থ চামগ্রাম রেল স্টেশনের পাশে স্ট্রেসকন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ— সিটু ইউনিয়ন, মালিক ও ম্যানেজমেন্টের একাংশ তাদের দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন।

গত ২৭ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্ট্রেসকন ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মচারী-সংগঠনের চেয়ারম্যান মানস চৌধুরী জানান, সিটু ইউনিয়নের গাফিলতি এবং মালিক ও ম্যানেজমেন্ট এর অসহযোগিতায় রেলের স্লিপার তৈরির এই কারখানাটি বন্ধ হতে বসেছে। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য বিভিন্ন ভাতা যেমন (ক) প্রোডাকশন (খ) মেডিক্যাল (গ) নাইট ভাতা পাচ্ছে না। এছাড়াও আরও কয়েকটি দাবী দীর্ঘ দিন থেকে পূরণ না হওয়ার জন্য তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাদের দাবীগুলি হলো— আট ঘণ্টার বেশী কাজ করিয়ে নিলেও, ডবল হাজিরা দেওয়া হচ্ছে না, শ্রমিকদের পি. এফ. করতে হবে, কাজের নিয়োগের দিন উল্লেখ করে নিয়োগ পত্র ও আইডেন্টিটি কার্ড দিতে হবে। সমস্ত শ্রমিকের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য ইন্সুরেন্স্-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তাহে একদিন ছুটি সহ জাতীয় ও রাজ্যস্তরের ঘোষিত ছুটিগুলি সমস্ত শ্রমিককে দিতে হবে।

কারখানায় গিয়ে দেখা গেল শ্রমিকেরা ধর্নাতে বসেছেন। দুখু মণ্ডল একজন দক্ষ শ্রমিক ছ্রন্নন্ধড় ত্রন্সনপ্তপ্তন্দস্তগ্ন। সরকারি নিয়মে তার মজুরী হওয়া উচিত দৈনিক ২৮০ টাকা, কিন্তু তিনি পাচ্ছেন ১১০ টাকা। একইভাবে সন্তোষ মণ্ডলও একজন দক্ষ শ্রমিক, যিনি বিপজ্জনক বয়লার অপারেটর। তিনিও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে অনেক কম, মাত্র ৭০ টাকা মজুরী পাচ্ছেন। আরও জানা গেল এই স্লিপার তৈরির কারখানাতে ৪০ জন শ্রমিক ৮ ঘণ্টাতে যেখানে ২০টির বেশি স্লিপার তৈরি করতে পারে না সেখানে রেলের অফিসারদের ঘুষ দিয়ে ৮ ঘণ্টাতে ৩০টি স্লিপার তৈরি করিয়ে নিচ্ছে, স্লিপার তৈরির উপকরণে ভেজাল দিয়ে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা। নিম্নমানের স্লিপার রেললাইনে বসালে রেল দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই। স্লিপার তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কংক্রিটের মশলাতে যদি এইভাবে ভেজাল দেওয়া হয় তবে রেল দপ্তরের হস্তক্ষেপ করা দরকার।

রেলের যে অফিসারদের স্লিপার তৈরির সময় উপস্থিত থাকার কথা তারা উপস্থিত না থাকলে স্লিপার তৈরির ত্রুটী এবং পরবর্তীতে তার জন্য রেলযাত্রীদের কোনও ক্ষতি হলে রেল মন্ত্রকও তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কেননা রেলমন্ত্রক থেকেই টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে স্লিপার তৈরির জন্য।

পাক মদতে আর কেন্দ্রের অপদার্থতায় অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ধুনি প্রজ্জ্বলিত ছিল। গত ২৮ জুন সন্ত্রাসবাদীরা একটিমাত্র সুযোগের পূর্ণসদ্ব্যবহার করা মাত্রই তা দাবানলে পরিণত হয়েছে। এই মুহূর্তে জ্বলছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। মুম্বই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ও জামাত উদ-দাওয়া নামক জঙ্গি সংগঠনের প্রধান হাফিজ সঈদ বিগত কিছুদিন যাবৎ পাকিস্তানের মাটিতে বসেই ভারতের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করছিল। গত ২৬ জুন রাত্রে পাক বিদেশমন্ত্রী মেহমুদ কুরেশী সরাসরি হাফিজকে সমর্থন করে বলেন, 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই রয়েছে।' এদিকে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত-বিরোধিতাকে উস্কে দিতে কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল জেহাদিরা। এতে পাকিস্তানের সরাসরি সরকারি মদত পেয়ে গত ২৭ তারিখ থেকেই আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ে জঙ্গিরা। তাদের হিংস্র আন্দোলনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গত ২৮ জুন গুলি চালাতে বাধ্য হয় জম্মু-কাশ্মীরে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন। তাতে দু'টি পৃথক ঘটনায় ন' বছরের একটি বালক সহ দু'জন নিহত হন। এর পরেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে যায় কাশ্মীরের। জানা গিয়েছে, ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে জেহাদি গোষ্ঠীর একদল লোক সোপর শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাতেই গুলি চালায় পুলিশ।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে দু'টি পুলিশ ফাঁড়িও বসানো হয়েছিল উত্তর-কাশ্মীর এলাকায়। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল মনে করছেন নিরাপত্তাবাহিনীরই একাংশ। ঘটনার পরেই সেখানে জারি করা হয়েছে কারফিউ। জেহাদি অধ্যুষিত সোপর শহরের মানুষ-জন এমনিতেই বিগত তিন দিন ধরে কারফিউ-এর নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। কারণ ২৮ জুনের গুলি-চালনার ঘটনার দিনতিনেক পূর্বে সি আর পি এফের গুলি চালনায় তিন জেহাদি যুবকের মৃত্যু হয় সেখানে। তারপরে লাগাতার কারফিউ জারি রয়েছে সোপরে।

সি আর পি এফে ডি জি বিক্রম শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, গত ২৮ তারিখ সকালে সোপরে একটি গুলিও খরচ করেননি তারা। খালি জল-কামানের মাধ্যমেই পরিস্থিতিটাকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে বিকেলের দিকে গুলি চালাতে বাধ্য হয় নিরাপত্তাবাহিনী। নইলে সাধারণ মানুষের জীবনহানি ওইদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত বলে তাঁর অভিমত।

সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, ওইদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সাতশোজনের একটি

বাহিনী আচমকাই সোপরের পার্শ্ববর্তী কুপওয়াড়া রোডস্থিত কাপরা থিয়েটার চত্বরে হামলা চালায়। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, সেই সময় ক্যাম্পে অল্পসংখ্যক সি আর পি এফ জওয়ানই উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা ছিলেন ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে, ডিউটি-তে। সি আর পি এফের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, চেকপোস্টের বাইরে কোম্পানী সংলগ্ন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কিছু অস্ত্র-শস্ত্রহীন মানুষকে মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের নাকি কাজ দেওয়া হয়েছিল 'সোপার চলো' ডাক দিয়ে জেহাদি গোষ্ঠীর যে মিছিলগুলো আসবে তা আটকানো!

ওই দিন দুপুর থেকে সোপরের সাধারণ মানুষের ঘরে লুঠ-পাঠ চালানোর পাশাপাশি পাথরও ছুঁড়তে আরম্ভ করে জেহাদিরা। আতঙ্কিত ভীত-স্বন্ত্রস্ত এবং পাথরাঘাতে আহত বহু সাধারণ মানুষ প্রায় শূন্য সি আর পি এফের চেকপোস্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবার জেহাদিদের সেই মিছিল হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়ে চেকপোস্টে। বড়সড় অঘটন তখনই ঘটতে পারত। অন্তত গুলি চালানোর দরকার ছিল ওই মুহূর্তেই। কিন্তু অসাধারণ সংযম দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত শূন্যে গুলি করে আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় তারা। বিকেলের দিকে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠাতে সি আর পি এফ সরাসরি জনতার ওপর গুলি চালাতে বাধ্য হয় বলে তাদের কর্তৃপক্ষ এক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। সি আর পি এফের গুলিতে সোপরে মারা গিয়েছে ১৭ বছর বয়সী তাজাম্মুল বসির ভাট এবং বারামুল্লার ডেলনা গ্রামে মারা গেছে ৯ বছর বয়সী তারিফ রাঠোর। পরোক্ষে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী কুরেশির জেহাদি কার্যকলাপে মদতদানের পাশাপাশি ওই ঘটনার পর হুরিয়ত কনফারেন্সের শীর্ষস্থানীয় নেতা মীরওয়াজ ওমর ফারুক বলেছে সি আর পি এফ কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। হুরিয়তের অন্য একটি গোষ্ঠী এর প্রতিবাদে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দু'দিন ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর আচমকাই শান্ত হয়ে যাবার দূরতম বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাটুকুও আপাতত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কারণ পাকিস্তান কাশ্মীরের জেহাদি আন্দোলনে মদত দিয়ে চলছে। কুরেশীর মন্তব্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। পাশাপাশি, জম্মু-কাশ্মীর সরকার হিন্দুদের ধোঁকা দিয়ে 'ডবল রোল' প্লে করছে। একদিকে ওমর আবদুল্লা ক্ষীরভবানী মন্দিরে গিয়ে পণ্ডিত সম্প্রদায়-কে স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আশ্বাস দিচ্ছেন, অপরদিকে তাদের নিরাপত্তার জন্য ঢাল হীন, তলোয়ার হীন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের কিছু 'নিধিরাম সর্দার'-কে নিয়োগ করছেন সশস্ত্র জেহাদিদের আটকানোর জন্য! আর সবচেয়ে অকর্মণ্যের ভূমিকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাক-চক্রান্ত আর জেহাদি হামলা সত্ত্বেও তারা কেন্দ্রীয় বাহিনী এ এফ এস পি এ-কে তুলে নিয়েছে বারুদস্তূপ কাশ্মীর থেকে। এমনকী, কোনও জেহাদি বা উগ্রপন্থী সেখানকার মানুষকে মারলে তার বিচার যাতে সামরিক আদালতে না হয়ে সাধারণ আদালতে (যেখানে মামলা শেষ করার নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমাই নেই। একটা গয়ংগচ্ছ পদ্ধতিতে সেখানে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি হয়) করার বন্দোবস্ত পর্যন্ত করতে চেয়েছে। যদিও নয়া সেনাপ্রধান ভি কে সিং এই দাবীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো এটুকুই।

কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হচ্ছে ছত্তিশগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হচ্ছে নকশাল কবলিত ছত্তিশগড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম ইতিপূর্বেই রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে তিনি স্বয়ং ছত্তিশগড়ে যাবেন। রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র সরকার। অন্য তিনটি নকশাল অধ্যুষিত এলাকা যেমন ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশাতে একইভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। এরাজ্যে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর নকশাল দমন নিয়ে বহু কৌশল ইতিমধ্যেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে নকশাল দমনের নামে জনজাতিদের ওপর অত্যাচার করছে যৌথবাহিনী। কিন্তু ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে এর প্রেক্ষিতটা পুরোপুরি আলাদা। গত কয়েক মাসে একশোরও বেশি সি আর পি এফ জওয়ান নিহত হয়েছে মাও হামলায়। কিন্তু কেন্দ্রের টনক নড়েছে সম্প্রতি সেখানকার নারায়নপুরের ধাউদাই থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে নকশাল হামলায় ২৬ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যুর পর। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় একজন আই-জি (অপারেশন) রাখা হবে। যাতে নকশাল-মোকাবিলা কেন্দ্র রাজ্য যৌথ সহযোগিতায় হতে পারে।

স্বরাষ্ট্র দফতরের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের কথায়— "সি আর পি এফের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে ছত্তিশগড় রাজ্য পুলিশের কথাবার্তা হবার পরই আমরা ছত্তিশগড়ে যৌথবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" জানা গিয়েছে, সি আর পি এফের বিক্রম শ্রীবাস্তব নারায়নপুরের ঘটনার পর নিজের উদ্যোগে ছত্তিশগড় পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। গত ২৯ জুন নারায়নপুরের ঘটনার পর অনুসন্ধান করে জানতে পারা গিয়েছে, সি আর পি এফ জওয়ানরা আসলে সামরিক পরিভাষায় যাকে বলে স্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এস ও পি এস) তাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছিলেন। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে কাদাশোলে জওয়ানরা যে ভুলটা করেছিল ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরেও তারা একই ভুল করে। নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় মাসের পর মাস ৬৩ জন জওয়ান একটিমাত্র রাস্তা ব্যবহার করত। যার ফলে জওয়ানদের গতিবিধি পুরোটাই নখদর্পণে এসে গিয়েছিল মাওবাদীদের। তারা সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে।

ছত্তিশগড়ে একটা সময় কেন্দ্রীয়বাহিনী ছিল। আবার তা নতুন করে আসতে চলেছে রাজ্যে। তবে রাজ্যটি নকশালদের 'রেড করিডরে'র মধ্যে অবস্থান করায় এখানে নকশালরা এমনিতেই একটু অধিক শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বাহিনী পাঠিয়েই তাদের দায়িত্ব সারছে। রমন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার যেভাবে উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়েছিল, একের পর এক মাও হামলায় তা বানচাল হতে বসেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বলে ছত্তিশগড়ের সরকারি কর্তা-ব্যক্তিদের অভিযোগ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এর মধ্যে কংগ্রেসের 'কৌশলী রাজনীতির'ও গন্ধ পাচ্ছেন। যাই হোক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নতুন 'ডিপ্লয়মেন্ট পরিকল্পনা' অনুযায়ী, সাম্প্রতিক অতীতে দান্তেওয়াড়া, নারায়নপুরসহ যে সকল স্থানে সি আর পি এফ জওয়ানরা আক্রান্ত হয়েছে, সেখানেই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হবে। এছাড়া দু'টি 'ট্রুপ পোস্ট'-এর মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে আনারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং কিছু ক্ষেত্রে বাহিনীতে দরকার মতো জওয়ানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথাও ভাবা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সহ চারটি রাজ্যে যে চারজন আই জি (অপারেশন) আধিকারিককে নিয়োগ করার কথা হয়েছে তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজস্থান ক্যাডারের আই পি এস পঙ্কজ কুমার সিং, ওড়িশার ক্ষেত্রে সি আর পি এফের পূর্ব ক্ষেত্রের আই জি নাগেশ্বর রাও-কে আনা হচ্ছে, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছেন যথাক্রমে এ পুন্নুস্বামী এবং এম পি নাথানেল।

মাও-নৃশংসতা

২৮ মে, ২০১০ ঃ মাওবাদীরা উড়িয়ে দিল রেলওয়ে ট্র্যাক, লাইনচ্যুত করল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসকে। মারা গেলেন ১৪৮ জন সাধারণ মানুষ।

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এ রাজ্যের শিলদা ক্যাম্পে হানা দিয়ে ২৪ জন জওয়ান হত্যা।

১৮ অক্টোবর, ২০০৯ ঃ মহারাষ্ট্রের গাড়চিরোলিতে লাহেরি পুলিশ স্টেশনে মাও-হানায় ১৭ জন পুলিশের মৃত্যু।

১৬ জুলাই, ২০০৮ ঃ ওড়িশার মালকানগিরিতে পুলিশভ্যানে ল্যাণ্ড মাইন বিস্ফোরণে ২১ জন পুলিশ-কর্মীর মৃত্যু।

২৯ জুন ঃ ওড়িশার বালিমেলা রিজার্ভারে গ্রে-হাউন্ড কম্যাণ্ডোদের পেট্রলবাহী নৌকায় মাওবাদীরা হামলা চালালে মৃতের সংখ্যা ৩৮-এ পৌঁছে যায়।

কেন্দ্রের শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজ্যে বি এম এসের বিক্ষোভ প্রদর্শন

সাংবাদিকদের মুখোমুখি এস পি সিনহা, দিলীপ পাল, লক্ষ্মা রেড্ডি এবং এন সি দে।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বি এম এস) দেশজুড়ে কেন্দ্র সরকারের শ্রমিক বিরোধী, গরীব বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে। বিভিন্ন রাজ্যে লেবার কমিশন-এর কার্যালয়ের সামনে ধর্না, বিক্ষোভ প্রদর্শন-এর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

বি এম এস-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত ২৯ জুন রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। নতুন সচিবালয়ের সামনে বি এম এস-এর নেতা-কর্মী-সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। শ্রম সচিব-এর মাধ্যমে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অনাদি সাহুর কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে ডেপুটেশন দেন। বি এম এস-রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাল জানিয়েছেন— ভারতে এক নম্বর শ্রমিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ সমিতিতে বি এম এস-কে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়নি। এজন্য তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সচিবালয়ের সামনে ধর্নায় বক্তব্য রাখেন দিলীপ পাল, জে এন চৌবে, কনক পানিগ্রাহী প্রমুখ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন কলকাতায় মানিকতলাস্থিত বি এম এস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে লক্ষ্মা রেড্ডি। শ্রী রেড্ডি একটি আঞ্চলিক বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি চলতি বছরে তিন তিনবার পেট্রল-ডিজেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কেন্দ্র সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করেন। এছাড়াও ঘর-গৃহস্থালীর কাজে দেশে-বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্র সরকারের নীতিহীন ও বিরোধী মনোভাবেরও তিনি তীব্র নিন্দা করেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনে ভারত সরকারের বিরূপ মনোভাব প্রকাশেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

মহিষাদলের ঐতিহ্যপূর্ণ রথযাত্রা

সংকর্ষণ মাইতি

মানব সভ্যতার অগ্রগতি শুরু হয়েছিল রথের মাধ্যমে। সে রথ ছিল ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। ঘোড়ায় টানা গাড়িকে প্রথমে রথ বলা হতো। চাকা আবিষ্কারের পর মানুষ গতির কথাই ভেবেছিলেন। গাড়ির সঙ্গে চাকা যুক্ত করে গতি সম্পন্ন করা। চাকা হলো গতির প্রতীক, আর ঘোড়ায়-টানা রথ হলো অগ্রগতির প্রতীক।...

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা হলো 'চরৈবেতি'। অর্থাৎ এগিয়ে চলা। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা। চাকাহীন গাড়ির সঙ্গে চাকা লাগিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা।... বর্তমানে ভারতের মানুষ হাতে টানা রথের সঙ্গে পরিচিত। যদিও রথের সঙ্গে যুক্ত থাকে জোড়া চলমান ঘোড়া বা অশ্ব। কাঠ বা অন্যধাতু দিয়ে গড়া অশ্ব। মনে হবে ঘোড়া অবশ্যই বর্তমানের রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রথের সঙ্গে কেন এই জোড়া অশ্ব? ফিরে যেতে হবে রাজা ইন্দ্রদুম্নের আমলে— যিনি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রানী গুণ্ডিচাদেবীর অনুরোধে মন্দির থেকে নিজেদের বাসগৃহে ঠাকুরদের আনিয়েছিলেন সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে করে। সুসজ্জিত গাড়ি বা শকটযানটিকে টেনেছিল দুটি টগবগে ঘোড়া। আগেই তো বলা হয়েছে ঘোড়ায় টানা গাড়িকে প্রথমে রথ বলা হতো। এখানেও তাই। এই রথে করে দেবদেবীর গমন— অর্থাৎ রথযাত্রা। গুণ্ডিচা গৃহের উদ্দেশ্যে ঠাকুরদের গমনকে রথযাত্রা বলা হয়েছে। পুরীতে রথযাত্রার আর এক নাম গুণ্ডিচাযাত্রা। কয়েকদিন গুণ্ডিচা গৃহে অবস্থানের পর দেবদেবীদের ফিরিয়ে আনা হতো মন্দিরে। মন্দিরে দেব-দেবীদের ফিরে আসা অভিহিত হলো পুনর্যাত্রায়। অর্থাৎ উল্টোরথ। সে সময় যেহেতু শকট-যান-রথটিকে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত, সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বর্তমানে রথের সঙ্গে কাঠের ঘোড়া সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বলা যেতে পারে প্রতীকী।...

কঠোপনিষদে রথযাত্রাকে মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব ইন্দ্রিয়ানি হয়ানা গীর্বিষয়াংস্তেষু গোচরম্।।"

শরীর হলো রথ। আত্মা রথস্বামী, বুদ্ধি হলো সারথি, মন মানুষের প্রগ্রহ বা লাগাম। আর সেই রথ জীবনের ভোগ বিষয়রূপ গমনপথের ওপর দিয়ে টেনে চলেছে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমূহ।

আমাদের সংসারকে রথের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রথটি হলো সংসার। রথস্থিত জগন্নাথ ঠাকুর হলেন উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ছাড়া কর্ম হয় না। চাকা হলো গতি। রথের রশি হলো কর্মের মাধ্যম। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও শ্রম দিয়ে সংসাররূপ রথকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

তুলনাটি আবার দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল দেশবাসীর কর্মে সচেষ্ট হওয়া— দেশ গড়তে দুহাত বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়া—দেশ-রথ থমকে থাকবে না, চলতে থাকবেই— জগন্নাথের রথের মতো গড় গড় করে এগিয়ে যাক দেশের উন্নয়নের রথ।...

জানা যায়, জগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবদেবীদের 'আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে গুণ্ডিচাবাটিতে' নিয়ে গিয়েছিলেন। হয়েছে রথযাত্রার সূচনা। দিনটিকে স্মরণ করে বর্তমানে ওই তিথি-পরম্পরায় রথযাত্রাটি হয়ে আসছে পুরীসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। (আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ছাড়া বছরের অন্যসময়ে অনেক রথযাত্রা চালু রয়েছে। তবে রথযাত্রা বললেই আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় প্রচলিত রথযাত্রাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।) পশ্চি মবঙ্গে পুরীর সঙ্গে মাহেশ এবং মহিষাদলের দুটি প্রাচীন রথযাত্রাও একই দিনে। মাহেশের রথের চূড়ার সংখ্যা নয়;মহিষাদলের রথের চূড়ার সংখ্যা তের।

* * *

প্রাচীনত্ব, রাজকীয় আড়ম্বর, লক্ষাধিক মানুষের সমাগম, আম-কাঁঠাল, গাছ-গাছালি ও একটি বিশাল কাঠের রথ নিয়ে মহিষাদলের রথযাত্রা। কবে থেকে রথযাত্রা শুরু? জানা যায়, রানী জানকী দেবীর আমলে মহিষাদলে রথযাত্রা শুরু। ১৭৬৯ সালে রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় মারা গেলে তাঁর ধর্মপত্নী জানকী দেবী ১৭৭০ সালে মহিষাদল রাজ-এস্টেটের দায়িত্ব নেন। তিনি সাহসের সঙ্গে যেমন রাজ-এস্টেট চালিয়েছেন তেমন বিভিন্ন জায়গায় দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। মায় বৃন্দাবন ধামে জানকীরমণ-এর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহিষাদলের রথে যে মদনগোপাল জিউ আরোহন করেন এঁর প্রতিষ্ঠাতা জানকী দেবী। এই মদনগোপাল জিউ এসেছেন স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে। কথিত আছে—

মেদিনীপুর জেলার কোনও এক জমিদারের মন্দির থেকে দারুমূর্তির একটি ছোট্ট কাঠ রূপনারায়ণ নদে ভেসে এসেছিল। এক ধীবর মাছ ধরতে গিয়ে ওই ছোট্ট কাঠটিকে নিয়ে এসে খড়ের চালাঘরের বাতায় তুলে

"রথে মদনগোপাল জিউ, জগন্নাথদেব এবং শালগ্রাম শিলা 'শ্রীধর' চড়েন। রাজকীয় আড়ম্বরের ঘাটতি রয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। তবে রাজডঙ্কা, রীতিনীতি, আচার-সবই বহাল রয়েছে। শুধু রাজকীয় জৌলুস-এর কিছুটা ম্লান হয়েছে। ভারতে কাঠের তৈরি তের চূড়ার রথ (উচ্চতায়) দ্বিতীয়টি আর নেই।"

রাখেন। কাঠটিতে নাকি চোখমুখ সবই ছিল। একদিন রানী জানকী দেবী স্বপ্ন দেখলেন। একজন দিব্য পুরুষের স্বপ্নাদেশ শুনলেন।

'ধীবরের বাড়িতে আছি। এখানে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। খড়ের চালের বাতায় আমাকে তুলে রেখেছে। এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও।..."

খোঁজ চলল। দেখা গেল, মহিষাদল পরগণার রাজচকের কাছে এক ধীবরের খড়ের চালাঘরের বাতায় দারুমূর্তিটি রয়েছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাঠটিকে রাজগড়ে আনা হয়। পরে ওই ছোট্ট কাঠের মূর্তিটিকে অক্ষত রেখে পূর্ণমূর্তির রূপ দেয়া হয়। মদনগোপাল জিউর মূর্তিটি কাঠ ও মাটির সংমিশ্রণে তৈরি। পাশে হ্লাদিনী শক্তি বিদ্যুৎবরণী শ্রীরাধিকার মূর্তিও তৈরি করা হয়।... কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওই ধীবরকে কয়েক বিঘা জমি দান করা হয়। ওই দান-করা জমি 'মদন পড়্যা' নামে পরিচিতি পায়। ঠাকুর হলো, মন্দির চাই। জানকীদেবী এক বিশাল মন্দিরের পরিকল্পনা করেন। ১৭৭৪ সালের মধ্যে ন' চূড়া বিশিষ্ট 'নবরত্ন' মন্দির তৈরি হলো। (মতান্তরে ১৭৭৮ সালের মধ্যে)। উচ্চতা সত্তর ফুটেরও বেশি। সর্বোচ্চ চূড়ায় পাঁচসের ওজনের একটি সোনার কলস ছিল, পরে সেটি খোয়া গেছে। নবরত্ন মন্দিরে মদনগোপাল জিউর প্রতিষ্ঠার পরে ওই মন্দির-চত্বরে দ্বারের দু'পাশে নহবত খানা তৈরি করা হয়।

* * *

রানী জানকী দেবী ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ভেবেছিলেন, মহিষাদলে বড় মেলা বা উৎসবের আয়োজন করলে কেমন হয়? পুরী ও মাহেশের রথের মেলা উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয়। অনুরূপ ভাবে এখানে রথের আয়োজন করলে প্রজাদের দারুণ আনন্দ হবে। মেলা বা উৎসবের স্বাদও পাবেন। একটি রথের পরিকল্পনা করে ফেললেন। ১৭৭৬ সালে সতেরো চূড়ার কাঠের রথ দিয়ে' মহিষাদলে রথযাত্রার সূচনা করেন। (মতান্তরে মতিলাল উপাধ্যায় এই সতের চূড়া রথটির প্রচলন করেন। সাল— ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ) কাঠের তৈরি সতেরো চূড়া (উচ্চতা-পতাকা সহ প্রায় আশি ফুট) রথটি তৈরি করতে সেসময় খরচ পড়েছিল সাত হাজার সিক্কা টাকা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির বাদশাহের (দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম— ১৭৫৯-১৮০৬) নামাঙ্কিত এই 'সিক্কা' টাকা নিজেদের টাঁকশালে তৈরি করতেন।

"Sikka is Badshahi rupee. The East India Company made this sikka on its mints. The name of Badshas were written on the Sikkas."

সতেরো চূড়ার রথ। সাতটি এক্সেলে চৌত্রিশটি চাকা ঘুরছে। এক্সেলের ওপরে শরদল আছে বারোটি। শরদলের ওপরে সমূহ চাকার খুঁটি। মাঝের খুঁটির উচ্চতা চল্লিশ ফুট। রথটি পাঁচ তলার। একতলা থেকে ওপরের তলায় যাওয়ার সিঁড়ি রয়েছে। রথের চারপাশে ঘুর-বারান্দা (Round Corridor)। রথের অঙ্গসজ্জা কম না। পতাকা তো আছেই। আর আছে কলস-চক্র-ঘণ্টা। সবই পেতলের। বারোটি চূড়ায় একটি করে ঘণ্টা, ওপরের চূড়ায় চারটি। প্রথম তলার চারকোণে চারটি সাধুমূর্তি এবং সামনে দুধসাদা রঙের বিশাল কাঠের দুটি ঘোড়া। ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে রেখেছে কাঠের তৈরি সারথি। রথের চার কোণে রয়েছে কৌণিক ভাস্কর্য। সিংহ, মকর, ময়ূর, সাহেব, বিভিন্ন জীবজন্তু, যুদ্ধ রত সেনা ইত্যাদি নিয়ে কৌনিক ভাস্কর্য— নাম 'দ্য চেন অব্ ডেথ্— মৃত্যুলতা। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে 'দ্য চেন অব্ ডেথে'র একটি নমুনা সংরক্ষিত রয়েছে। এটা গর্বের বিষয়। 'The chain of death' of this chariot, is preserved at 'The Victoria and Albert Museum' London.

প্রথমে রথের চূড়ার সংখ্যা ছিল সতেরো। পরে হয়েছে তের। একই রথে চূড়ার পরিবর্তন। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস—সতেরো চূড়ার রথটি রূপনারায়ণ নদে ডুবে গেছে আর ফেরেনি। কিংবা ১৮৫২ সালে রথের চাকায় ৭ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই হেতু রাজা-সাহেব ওই সতের চূড়ার রথ বাতিল করে তের চূড়ার রথ তৈরি করেন। আসলে এগুলি মানুষের কল্পনা। আসল ঘটনাটি জানা দরকার।

১৮০৫ সালে রানী জানকীর দৌহিত্র গুরুপ্রসাদ গর্গ (মা মন্থরা বাবা ছক্কন-প্রসাদগর্গ) হেবা-সূত্রে মহিষাদলের সিংহাসনে বসেন। উপাধ্যায় বংশের পরে গর্গ বংশ। এই গর্গ বংশের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব লছমন প্রসাদ গর্গ (ইনি রামনাথ গর্গের পালিত সন্তান) আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটান, যাতায়াতের জন্য বাঁকা নালার ওপর পুল করে দেন।— জনহিতকর কাজ করে সুনাম অর্জন করেন। (রাজত্বকাল ১৮৪১-১৮৭৯)। হয়েছে কী, ১৮৬০ সালে এঁর ফ্রান্সের এক বন্ধু, নাম মতিনো পেরু (Martineu Perud) মহিষাদলে রথ দেখতে আসেন। তিনি রথের নীচের বেখাপ্পা অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের ফ্রেমসহ চারটি চূড়া বাদ দিতে বলেন। ১৮৬১ সালে রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ নীচের ওই চারটি চূড়া বাদ দিয়ে চারটি কাঠের মানুষের দণ্ডায়মান মূর্তি বসানোর ব্যবস্থা করেন। চার কোণে সাধুর মূর্তি বসান। কলকাতা থেকে চীনা মিস্ত্রিরাও এসেছিলেন। সতেরো চূড়ার রথ তের চূড়ার রূপ নিল। সতেরো চূড়ার রথ ডুবতেও যায়নি কিংবা বাতিলও করা হয়নি। ১৯১২ সালে রাজা সতীপ্রসাদ গর্গের আমলে রথের প্রথম সংস্কার। দুটো কাঠের সাদা ঘোড়া সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয়েছে। রথের রঙ নীলরঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। সেই ১৭৭৬ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত একই রথ টানা হয়েছে। ২০১০ সালে রথের বয়স হবে ২৩৪ বছর। কেবলমাত্র এক বছর ১৯৩২ সালে রথ চলেনি। রথের দিন স্বদেশী আন্দোলনে পিকেটিং, গ্রেপ্তার ইত্যাদি কারণে রথ টানা বন্ধ। তবে রথের মেলাটি যথারীতি হয়েছে।

রাজগড়ের নবরত্ন মন্দির থেকে রথ বেশ দূরে। রথের আগের দিন বিকেলে রথের সামনে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়। শালগ্রাম শিলা 'শ্রীধর' আসেন। শ্রীধরের পুজোর পর রথের সর্বোপরি তের নম্বর চূড়ায় ঘণ্টা-চক্র-কলস-সমন্বিত পতাকা-দণ্ডটি সন্নিবেশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে স্থানীয় ভাষায় 'লেদ' বাঁধানো বলে। কেউ কেউ 'নেত্রোৎসব'-ও বলে থাকেন। রথের চক্ষুদান-উৎসব। তার মানে দীর্ঘ এক বছর ধুলো ময়লাবস্থায় থাকা রথটিকে পরিষ্কার করে সুসজ্জিত করা। পরের দিন রথযাত্রা। রথযাত্রার প্রাক্কালে পূর্ব দিনের বৈকালিক অনুষ্ঠানটিকে বলা যেতে পারে রথযাত্রার উদ্বোধন-উৎসব।...

রথে মদনগোপাল জিউ,
জগন্নাথদেব এবং শালগ্রাম শিলা 'শ্রীধর' চড়েন। রাজকীয় আড়ম্বরের ঘাটতি রয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। তবে রাজডঙ্কা, রীতিনীতি, আচার-সবই বহাল রয়েছে। শুধু রাজকীয় জৌলুস-এর কিছুটা ম্লান হয়েছে। ভারতে কাঠের তৈরি তের চূড়ার রথ (উচ্চতায়) দ্বিতীয়টি আর নেই। রথ-

(এরপর ৯ পাতায়)

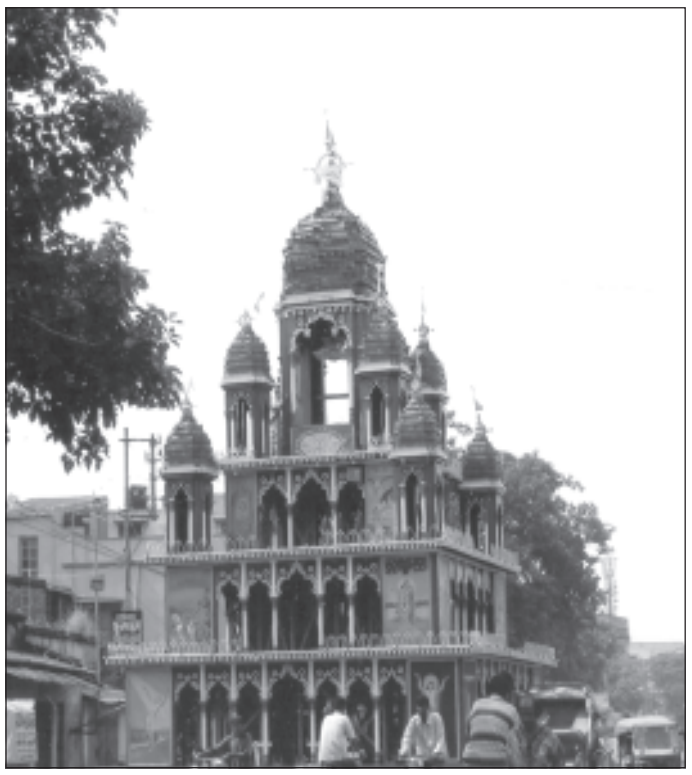

মাহেশের রথের চালচিত্র

নবকুমার ভট্টাচার্য

কথিত রয়েছে রথের দেবতা জগন্নাথদেবকে রথের মধ্যে দর্শন করলে আর পুর্নজন্ম হয় না। নানা দুঃখ কষ্টের হাত থেকে চিরমুক্তি ঘটে। এই বিশ্বাসের জন্যই রথযাত্রার উৎসবে ভক্তবৃন্দের এত উন্মাদনা। রথের রশির একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য রথের চাকায় পিষ্ট হওয়ার ভয়কেও দূরে সরিয়ে রাখেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে, জীবনে একবার পুরীর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে সারা জীবনের পাপক্ষয় হয়। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় তাই পুরীতে আট-নয় লক্ষ পুণ্যার্থী জমায়েত হন।

পুরীর মতো শ্রীরামপুরের মাহেশের রথেও প্রতি বছর মহাসমারোহের সঙ্গে জগন্নাথদেবের পুজো করা হয়। প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ ভাগীরথীর পশ্চি মতীরবর্তী মাহেশে পরমসাধক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী সপ্নাদৃষ্ট হয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গদেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জানতেন কলিতে মুক্তির ঠাকুর জগন্নাথ। তিনি জগন্নাথদেবের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে পাবার জন্য দেশের নানাতীর্থে পর্যটন করেন। অবশেষে জগন্নাথদেবের ইচ্ছায় তিনি মাহেশ গ্রামে আসেন এবং ভাগীরথীর তীরে কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়। এক দুর্যোগময় রাতে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী গঙ্গার তীরে বসে রয়েছেন, চোখে ঘুম নেই, দৃষ্টি গঙ্গার জলে নিবদ্ধ। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় তিনি দেখতে পান একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি গঙ্গায় ভেসে আসছে। তিনি পাগল হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন এবং গাছের গুঁড়িটিকে নিয়ে আসেন। চোখে আনন্দের ছাপ এবং মুখে জগন্নাথ ধ্বনি। সহায় সম্বলহীন ব্রহ্মচারী ওই গ্রামেই অদ্ভুত দারুময় জগন্নাথ দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারীর দেহাবসান হলে কমলাকর পিপলাই ও নিধিপতি পিপলাই নামে দুই সহোদর সুন্দরবন অঞ্চ ল থেকে এসে জগন্নাথের সেবকরূপে ব্রতী হলেন। সে সময় মাহেশ বনময় ও জনশূন্য ছিল। ওই দুই ভাই ওই গ্রামে লোকের বসতি বসান। পরে পরে কলকাতার এক ধনাঢ্য বৈষ্ণব নয়নচাঁদ মল্লিক জগন্নাথের এক মন্দির নির্মাণ করে দেন। কয়েকবছর পরে ভাগীরথীর ভাঙ্গনে ওই মন্দির ধবংস হয়ে গেলে কলকাতার গৌরাঙ্গচরণ মল্লিক পুনরায় মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং কলকাতার নিমাইচরণ মল্লিক জগন্নাথের নিত্য সেবার জন্য মাসিক ৬০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। মাহেশে জগন্নাথ মন্দিরের প্রথম অধিকারী কমলাকর পিপলাই এখানে রথযাত্রার প্রবর্তন করেন। কমলাকর নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আর এজন্যই মাহেশে জগন্নাথ দর্শনে চৈতন্যদেব একবার উপস্থিত হন। রথের সময় একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এখানে উপস্থিত ছিলেন। এর বহু পূবেই কলকাতার কৃষ্ণচন্দ্র বসু জগন্নাথের বার্ষিক আরোহনের নিমিত্ত এবং রথ যাওয়ার জন্য যে প্রশস্ত পথ রয়েছে তা নিজধনে ক্রয় করেছিলেন। প্রথম রথটি ভগ্ন হওয়ার পর কৃষ্ণচন্দ্র বসুর উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ বসু দ্বিতীয় একখানা রথ নির্মাণ করে দেন। ১২৬০ সালে গুরুপ্রসাদ বসুর উত্তরাধিকারীগণ পুনরায় আবার এক রথ নির্মাণ করে দেন। পূর্বে গঙ্গাতীরের পথে রথ চলত। সেই স্থান নদীর গর্ভস্থ হওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে স্থান ক্রয় করে পথ নির্মাণ করে দিতে হয়। পূর্বে কাঠের রথ ছিল বলে প্রতিবছর রথ তৈরি করতে হত। এখান লোহার রথ তৈরি হয়েছে। ১৮৮৫ সালে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র বসুর অর্থে এই লোহার রথটি তৈরি করে দেন মার্টিন বার্ণ কোম্পানী। রথটি ত্রিতল, নয় চূড়া বিশিষ্ট। বারোটি বৃহৎ লোহার চাকা রয়েছে। এই রথটি তৈরি করতে তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। নানা দুর্ঘটনায় মাহেশের রথ বারবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। ১৮৩৫ সালে গুরুপ্রসাদ বসু যে রথ তৈরি করে দেন তা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ১৮৫২ সালে কালচাঁদ বসু যে রথ তৈরি করে দেন তাতে জনৈক ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যান। ১৮৫৬ সালে বিশ্বম্ভর বসু যে রথ তৈরি করে দেন তাও অগ্নিদগ্ধ হয়। মাহেশের রথের মেলা ছিল বিখ্যাত। এই মেলার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসে পাওয়া যায়।

কমলাকর পিপলাই মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণ পরবর্তীকালে জগন্নাথের সেবাইত ছিলেন কিন্তু নিধিপতির সন্তানেরা অধ্যাপক হয়ে চতুষ্পাঠী করে জগন্নাথের সেবাদি ত্যাগ করেন। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য হলো মাহেশে কখনও মূর্তি বদলানো হয় না। প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা উৎসবে মহাপ্রভুর গায়ে রঙ করা হয়। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে প্রসাদগ্রহণ করে নিষ্ঠাবান ভাস্কর প্রভুর অঙ্গরাগ করেন। এটাই 'নবযৌবন' নামে পরিচিত। এর একদিন পরে রথযাত্রা উৎসব। মাহেশে শত শিকল নামের একটি উৎসব হয়। সোজা রথের দিন থেকে উল্টো রথের মধ্যে একটি রবিবারে মাসির বাড়ি পর্যন্ত নামকীর্তনের একটি দল বেরোয়। প্রায় ১০৮টি খোল বাজে এদিন। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রদ্ধার্ঘে এই উৎসব পালন করা হয়। এখানকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ভাদ্রমাসের ভরা কোটালের সময় যখন নদীতে বান আসে সেই জল তুলে রাখা হয়। স্নানযাত্রার দিন সেই জল ও দুধ মিশিয়ে মহাপ্রভুকে স্নান করানো হয়।

জগন্নাথ রথের প্রতিবছর পার্শ্ববর্তী বল্লভপুরে গুণ্ডিচা বাড়ি (মাসির বাড়ি) যেতেন। এখানে রাধাবল্লভের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে বল্লভপুর বলে কোনও গ্রাম ছিলই না। মুর্শিদাবাদের নবাবের কোন প্রধান কর্মচারী চিতপুরের নবাবের নিকট যাওয়ার সময় এই স্থানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরাধাবল্লভের প্রতিমূর্তি দেখে কৌশল ক্রমে আকনা ও মাহেশ এই দুই গ্রামের কিয়দংশ ছাঁট করে রাধাবল্লভের নামানুসারে বল্লভপুর নামকরণ করে দেন। তখন ওই গ্রামের রাজস্ব বার্ষিক ১৮ টাকা ছিল। কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ ওই গ্রাম ভারজাই মহল করে দেন। পরবর্তীকালে নদী প্রবলা হলে ওই বল্লভপুর গ্রাম পশ্চি ম দিকে সরে আসে। রাধাবল্লভকে স্থানান্তরে যেতে হলো। ১৬৮৫ শকাব্দে গৌরচন্দ্র মল্লিক পুনরায় মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং সেবার জন্য নিত্য দু'টাকা বৃত্তি প্রদান করেন।

পূর্বে পূর্বে মাহেশের জগন্নাথ মাসির বাড়ি রাধাবল্লভের মন্দিরে থাকতেন। ১২৫৭ সালে উভয় পক্ষীয় অধিকারিগণের মধ্যে প্রণামী নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে জগন্নাথপক্ষীয় সেবাইতরা বল্লভপুরে ওই বৎসরে জগন্নাথের প্রতিমূর্তি নিয়ে এলেন না। তাতে রাধাবল্লভের পোষ্যগণের খর্বতা হওয়ায়, কলকাতার বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন জগন্নাথ ও এক বৃহৎ রথ নির্মাণ করে দেওয়ায় মাহেশ ও বল্লভপুরে দুই গুণ্ডিচা বাড়ি হয়।

মাহেশের রথ নিয়ে ১১ জুলাই ১৮১৮ সালের 'সমাচার দপর্ণ' পত্রিকায় বলা হয়েছে— "রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড়। এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয়। এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসরে রথ চলন স্থানে নতুন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কত দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইলে কোনও প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল। অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আন্যেরস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।' ১২৩৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হলো— 'এ বছর মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে।'

মাহেশের রথযাত্রার মেলা জুয়াখেলার জন্য প্রখ্যাত ছিল। ১৮১৯ সালে জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে বউ বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিল এক জুয়াড়ী। ৬ আষাঢ় ১২২৬ বঙ্গাব্দের 'সমাচার দর্পণ' এ প্রসঙ্গে লিখেছিল— 'ওই যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো কাহারো লাভ হয় ও কাহারো কাহারো সর্বনাশ হয়। এইবার স্নান যাত্রার সময়ে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন...দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ওই ব্যক্তি খেলার দেনার কারণে কয়েদ হইল।'

মহিষাদলের ঐতিহ্যপূর্ণ রথযাত্রা

(৮ পাতার পর))

সড়ক মাটির। প্রায় এক কিমি রথ-সড়ক পেরিয়ে রথ গুঞ্জিটা বাটিতে থামে। গুঞ্জিটাবাটির আকর্ষণ একসময় ছিল। যাত্রা, নাটক কত কী হতো। গুঞ্জিটাবাটির প্রাচীর নেই। আছে মন্দির— সামনে নাট মন্দির। গুঞ্জিটা বাটিতে ন'দিন কাটিয়ে দেবতারা আবার ফিরে যান রথে চড়ে। রথ থেকে নবরত্ন মন্দিরে।...

আগে রথযাত্রার মেলায় সার্কাস, অস্থায়ী চিড়িয়াখানাসহ অনেক দোকানদানি দেখা যেত। স্থানাভাবে সেসব আর চোখে পড়ে না। তবে ঐতিহ্যের রথযাত্রায় পুণ্যকামী নরনারীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

চারটি রশি ধরে হাজার হাজার মানুষ রথ টানছেন— বলা বাহুল্য, মহিষাদলের সংস্কৃতিকেই যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ— লেখক ২০০০ সাল থেকে মহিষাদলের রথের ও রথযাত্রার ইতিহাস সহ (রথ চলাকালীন) ধারাভাষ্য দিয়ে আসছেন।

তথ্য সহায়তা—

● মহিষাদলের রথযাত্রা— দেবপ্রসাদ গর্গ / ল্যাকেটু পত্রিকা / বাংলা ১৩৭৬ আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা।

● বাংলার দারু ভাস্কর্য— তারাপদ সাঁতরা / মার্চ ১৯৮০।

● পুরী মাহেশ ও মহিষাদলের রথযাত্রা —সংকর্ষণ মাইতি।

● The car-festival of Mahishadal– by Sankarshan Maiti.'

ইসলামে নারী-পুরুষ বৈষম্য

ভারতে ইসলামিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংগঠন দারুল-উলুম-ইসলাম (দেওবন্দ) সম্প্রতি ফতোয়া দিয়েছে—মেয়েদের শিক্ষা, চাকরি, তাঁদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের লোকজনের গ্রহণ করা, জন্মদিন পালন করা ইত্যাদি ইসলামি আদর্শের বিরোধী। ইসলাম এসব অনুমোদন করে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যখন নারীশিক্ষা বিশেষ করে মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, মুসলিম নারীদের জন্য চাকরিতে বেশি সংখ্যায় সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে তখন দারুলের এই ফতোয়া সৃষ্টি করেছে নতুন করে বিতর্ক, যা মুসলিম নারীদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কী অন্তরায় সৃষ্টি করবে না? যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক সংগঠন মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকেই হাতিয়ার করার কথা বলছে তখন সেই উন্নয়ন কি নারীদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হবে? দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অগ্রগতিতে মুসলিম নারীদের কোনও অবদান থাকবে না? তাঁর কী কেবল অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হবেন? ইসলাম নাকি সাম্যের কথা বলে। যদি তা-ই হয় তবে নারী ও পুরুষের মধ্যে এই ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্য কেন? ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সমানাধিকার সুরক্ষিত। শিক্ষা, চাকরি, বাক্ স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি থেকে মুসলিম নারীদের বঞ্চি ত করে বা দূরে সরিয়ে রেখে যাঁরা সংবিধানকে অবমাননা করছেন তাঁরা কি সংবিধান বিরোধী কাজই করছেন না? ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হিন্দু নরনারীরা যখন সমানতালে এগিয়ে চলছেন, তখন মুসলিম নারীরা অন্তঃপুরে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন।

আসলে ভারতের দু'রকম বিধান, বিশেষত মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা শরিয়তী আইন ভারতের মুসলিম নারীদের মৌলিক অধিকার হরণ করে তাঁদের সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাছাড়া ইসলামের ধর্মীয় ব্যাখ্যা এতটাই গোলমেলে যে, এক এক গোষ্ঠী বলছেন এক এক রকম কথা। যখন এক দারুল বলছে, মেয়েদের শিক্ষা, চাকরি ও তাঁদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের লোকজনদের গ্রহণ করা ইসলাম বিরোধী তখন অন্য এক দারুল বলছে ঠিক উল্টো কথা। তারা বলছে, মেয়েদের শিক্ষা, চাকরি ও তাঁদের উপার্জন পরিবারের গ্রহণ ইসলাম বিরোধী নয়। বরং মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রশ্ন, কাদের কথা ঠিক? তবে নারীর উপার্জিত অর্থ পরিবারের অন্যদের পক্ষে হারাম বলে দারুল-উলুম দেওবন্দ যে ফতোয়া জারি করেছে তা অত্যন্ত অমানবিক এবং সভ্য সমাজের কলঙ্ক।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

মাওবাদী সমস্যা ও পুরুলিয়া

বান্দোয়ান শিরিষগোড়া গ্রামের বাসিন্দা রাজীব মণ্ডল। স্নাতক কলা বিভাগের ছাত্র। গৃহশিক্ষকতাই তার প্রধান জীবিকা। পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বান্দোয়ান থানার নিকটবর্তী গ্রাম—শিরিষগোড়া। এই একটি মাত্র গ্রামকে মাওবাদীরা কব্জা করতে পারেনি। শিরিষগোড়া গ্রাম বান্দোয়ানের স্নায়ুকেন্দ্র। শিরিষগোড়া গ্রামের রাজীব মণ্ডলের সঙ্গে কথাবার্তায় ফুটে উঠল মাওবাদীদের চালচিত্র। সাধারণ মানুষ কোনও দিনই চাননি সমস্ত ক্ষমতা চলে যাক মাওবাদীদের হাতে। তাদের বক্তব্য জঙ্গলমহলের মানুষও মাওবাদীদের উপদ্রব সহ্য করতে পারছে না। কবে মুক্ত হবো মাওবাদীদের হাত থেকে? এই প্রশ্ন সবার। আশপাশের গ্রাম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে যুবকরা মাওবাদীদের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের জিজ্ঞাস্য, যারা একবার মাওবাদীদের কবলে পড়েছে তারা কি আর ফিরে আসতে পারবে? ফিরলেও তাদের মৃত্যু অবধারিত। সরকার কি তাদের শান্তিতে ঘরে ফেরাতে পারবে। নানান প্রশ্ন তাদের মনের মধ্যে।

মাওবাদীদের লক্ষ্য হচ্ছে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা। সাধারণ মানুষকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সাধারণ মানুষকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বলা হচ্ছে মাওবাদীদের ক্ষমতা মানে তোমাদের ক্ষমতা। অন্য কোনও সরকারের হাতে থাকা মানে তাদের হাতের পুতুল হওয়া। সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দল বৃদ্ধি করাই হচ্ছে মাওবাদীদের কাজ।

যার ফলে হাজার হাজার যুবককে মাওবাদীদের দলে ভর্তি করেছে। বিনিময়ে কিষানজী তাদের বেতন দিচ্ছে। দিনের পর দিন তারা মাওবাদীদের নির্দেশে ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত যুবকদের ভবিষ্যৎ কি? এই সমস্ত কথা রাজীব মণ্ডলের মুখ থেকে শোনা।

এবার চাকুরীজীবীদের কথা। তাদের আয়ের অর্ধেক টাকা মাওবাদীদের হাতে দিতে হয় বলে অভিযোগ। এই টাকা দিয়ে মাওবাদীদের খাওয়া খরচ থেকে তাদের বেতন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে গিয়ে বলে দিয়ে আসছে, 'আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কয়েক লাখ টাকা দিতে হবে, নিতে আসছি'। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাকে চিরতরে ইহলোক থেকে বিদায় করা হচ্ছে। এতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না। পরিবারকে খতম করে দেওয়া হচ্ছে। রোজ কোনও না কোনও গ্রামে তারা মিটিং করছে। মিটিংয়ে না গেলে তাদের শাস্তি দিচ্ছে। মাইকে হুলিয়া জারি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের টুঁ শব্দ করার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই। এরকম পরিস্থিতি নির্মাণ করেছে মাওবাদীরা।

মাঝেমধ্যে হুলিয়া জারি করে বলা হচ্ছে— আজ গ্রামের সমস্ত পরিবারে একবেলা অরন্ধন থাকবে। ওইদিন কোনও ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাবে না। ফলে অধিকাংশ দিনেই স্কুলগুলি বন্ধ থাকে। স্কুল শিক্ষকরাও অনুপস্থিত থাকে। প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল শিক্ষকরা মাওবাদীদের ভয়ে তটস্থ। ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পড়ার পরিবেশ থাকছে না। অনেক রাজনৈতিক নেতারা গ্রামছাড়া। অফিস-আদালতের কর্মচারীরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। সন্ধ্যা হলে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে মানুষ জঙ্গলমহলে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কতো মানুষ পালিয়ে আসছে। কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে ক্ষয় ক্ষতি। এই পরিস্থিতি বদলাবে কে? রাজীব মণ্ডলের প্রশ্ন।

রাজনৈতিক দল কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে মত্ত। সাধারণ মানুষ পড়েছে যাঁতাকলে। তারা কোন দিকে যাবে? দিশাহারা। একূলে গেলে মরণ। ওকূলে গেলেও মরণ। মরণ ফাঁদ তৈরি করছে রাজনৈতিক দলগুলি। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য, তাদের উন্নয়ন হয়নি বলে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আমাদের বিপক্ষে। পি. চিদাম্বরম তাদের জন্য সবকিছু দরজা খুলে রেখেছে। সেই সুযোগে ছত্তিশগড়ে শত শত জওয়ানকে প্রাণ দিতে হলো মাওবাদীদের হাতে। ট্রেনে মৃত্যুবরণ করতে হলো নিদ্রিত সাধারণ যাত্রীদের। এই পরিস্থিতিতে কার উপর ভরসা করবো আমার? অথচ সরকার ইচ্ছা করলে মাওবাদী সমস্যা নিমেষের মধ্যে সমাধান করতে পারে। সেই ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারের আছে, আমরা আশাবাদীও। দলমত নির্বিশেষে একমত হয়ে নামতে হবে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। তারা আলোচনার পক্ষপাতী নয়। অথচ দিনের পর দিন রক্তের হোলি খেলছে তারা। তাদের লক্ষ্যে তারা অটল। তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে তখন যখন জল, স্থল, আকাশ সব দিকে নজর দিয়ে চিরুণি তল্লাসি চালানো হবে। তবেই সাধারণ মানুষকে মাওবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন করা তবেই সম্ভব। এহেন পরিস্থিতিতে সরকার উন্নয়ন চাইলে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষ প্রথমে চায় নিজেকে নিরাপত্তা দিতে। সরকার এই নিরাপত্তা দিতে পারলেই হাজার হাজার মানুষ উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতিতে ইচ্ছা থাকলেও কেউই এগিয়ে যাবে না। মাওবাদীদের পাকড়াও করতে হবে। সে ক্ষমতা সরকারের আছে। এখনই সমূলে ধ্বংস না করতে পারলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকেও ঘরে ফেরানো যাবে না। এই পদক্ষেপ দ্রুত নিতে হবে। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা থেকেই যাবে।

—জয়রাম মণ্ডল, পুরুলিয়া।

শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় পরিবর্তন

সাম্প্রতিক উভয় বাংলার পরিবর্তনের ঝড়ের মাঝেও সুদূরপ্রসারী কোনও সিঁদুরে মেঘের ঘনঘটা দেখা যায় না কি? আপনভোলা বাঙালী 'পথ ভোলা এক পথিক' হয়ে পরিবর্তনের সুযোগে এপার বাংলাকে ঠেলে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রাক স্বাধীনতার সেই উত্তাল অতীতের দিকে। তাই নয় কি? একটু পিছন ফিরে দেখা যাক।

১৯৩৬ ও ১৯৪৬-এর নির্বাচন দুটি প্রায় সমগ্র বাংলার ভাগ্য লিখে দিয়েছিল। জাতির জনকের কংগ্রেস, ইংরেজ, বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—শাসক ও ভাবী-শাসক—সকলের যুগপৎ প্রচেষ্টায় বাংলা 'অন্ধকূপে' নিমজ্জিত হচ্ছি। ইতিপূর্বে ঘটে গিয়েছে বাংলাকে (সমগ্র) গ্রাস করার সলতে পাকানোর কাজ কলকাতা, নোয়াখালি সহ প্রায় সমগ্র ভারতে। নেহেরু কংগ্রেস লালকেল্লায় বিনা রক্তে স্বাধীনতার ভাষণ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত;বাংলার দিকে তাকানোর সময় কই? আর বাংলার কর্তাভজা রাজনীতিকরাও স্বাধীন যুক্তবঙ্গের মসনদের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেখানে ভবিষ্যতে সমগ্র হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতিটাই জিন্ন প্রসূত অবাঙালী পশ্চি মী ধর্ম-সংস্কৃতির করাল গ্রাসে চলে যাবে। একমাত্র বাধ সাধলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

ডঃ মুখার্জী কুচক্রীদের ভবিষ্যৎ রূপরেখা উপলব্ধি করে বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্ম রক্ষার জন্য কংগ্রেসইংরেজজিন্নার যুগপৎ ভারত ভাগের প্রতিবাদে পাকিস্তান ভাগ করলেন। আর এই পাকিস্তান ভাগের ফসল আমাদের এই পশ্চি মবাংলা। ঐতিহাসিক তারকেশ্বর সম্মেলনে ডঃ মুখার্জীর সাথে তৎকালীন বাংলার সকল মনীষীরাও ছিলেন; যেমন ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী। (পত্র- লেখকের ছোট ঠাকুরদাদা), ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ যদুনাথ সরকার প্রমুখ (তথ্যসূত্র ঃ বাঙালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ)। বাংলার ৯৫ শতাংশ মানুষ্যই সেদিন সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরোধিতা করে ডঃ মুখার্জীর আন্দোলকে সমর্থন করেছিল। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মুসলীম লীগের দাঙ্গায় বেশি আস্ফালনের দরুণ হিন্দু বাঙালী সকলকে এ বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে সে সুস্থ জীবনযাপন করার মর্যাদা পায়নি। এমনকী ১৯৫০-এ যোগেন মণ্ডলরাও ভুল বুঝে অত্যাচারিত হয়ে এপারে পাড়ি জমিয়েছিল। বহুদর্শী ডঃ মুখার্জীর দূরদর্শিতায় আজ এখানে সবাই নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারছে। তাঁর দূরদর্শিতা ১৯৭১ এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছিল। ওপার বাংলা থেকে লাগাতার হিন্দু বাঙালীরা অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়নের মধ্য দিয়েও হয়েছিল। আজও বাঙলির কী কোনও শিক্ষা হয়নি? যেখানে সবাই করে-কম্মে খেতে পারছে, সেখানে ডঃ মুখার্জীকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। এটা কি কেবল ডঃ মুখার্জীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত; না সমগ্র বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে? আবার এ বাংলায় বামফ্রন্টের দীর্ঘ বামপন্থী শাসনের বিরুদ্ধে যে 'পরিবর্তন ঝড়' তা কি বাঙালী সংস্কৃতির স্বপক্ষে নয়?

অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডঃ মুখার্জীর দূরদর্শিতা জানা ও জানানো দরকার।

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

অরাজকতার রাজ্য

রাজ্যে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পশ্চি মবঙ্গ যেন ক্রমশ নৈরাজ্যের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি আর এস এস-এর দ্বারহাট্টা (জেলা-হুগলী) কার্যালয়ে যথাসর্বস্ব চুরি যাওয়ার ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করছে। যেন বর্তমান প্রশাসনের কোনও দায়িত্ব-কর্তব্য বলে কিছু নেই। অথচ এ ঘটনা কোনও লালঝাণ্ডাধারী অফিসে হলে পুলিশ প্রশাসনের কালঘাম ছুটে যেত। অর্থাৎ পশ্চি মবঙ্গের পুলিশ তথাকথিত বাম নেতা-নেত্রীদের আশ্রিত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। কিন্তু রাজ্যে আইন আছে, সেই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার উপায়ের অভাব নেই। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ক্রমশ গ্রাস করেছে। পশ্চি মবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ক্রমবর্ধমান। অথচ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভালো বলে দাবি করেন বাম নেতারা। পশ্চি মবঙ্গকে শান্তির মরুদ্যানও বলে থাকেন। কিন্তু অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে কতটা শান্তি বজায় আছে? রাজ্যে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদীদের অবাধ বিচরণ কি প্রমাণ করে? বিভিন্ন জায়গায় গণহত্যা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? রাজ্যে সশস্ত্র হার্মাদদের আক্রমণাত্মক মনোভাব কি শান্তি স্থাপনের লক্ষণ? খুন, জখম, অত্যাচার, ব্যভিচার যেভাবে রাজ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তাতে আইনশৃঙ্খলার সার্বিক অবনতি হয়েছে তা বলা যায়। প্রশাসনিক মদতে খুন সন্ত্রাসের রাজনীতির ফলে সর্বত্র একটা অশান্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। ন্যায়, নীতি, আদর্শ যেখানে সুদূরপরাহত, রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকা নেয় সেখানে অরাজকতা সৃষ্টি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দুর্নীতি আমাদের ভিত্তি, অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ'-স্লোগানই এখন বাম নেতাদের শোভা পায়। রাজ্য রসাতলে গেলেও কিছু যায় আসে না। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি ই মূল কথা। তাই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে এ রাজ্যে যে কোনও অপরাধমূলক বেআইনী কাজের আইনী সুবিচার পাওয়া নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। তাই সাধারণ নিরীহ মানুষেরা আজ অসহায়, আতঙ্কিত।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

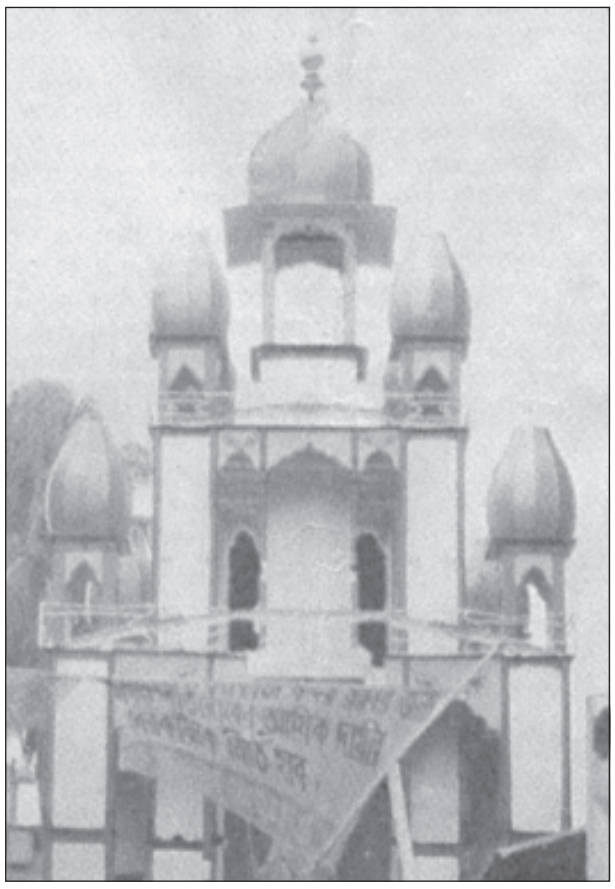

চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জের রথ

নির্মল কর।। সার্ধ-দ্বিশতবর্ষের ঐতিহ্যপূর্ণ চন্দননগরের রথযাত্রার ইতিবৃত্তটি নানা অলৌকিকতা এবং একাধিক ঘটনার সমাবেশে ভরা। ১৭৬০ সালে রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বাংলার যখন টালমাটাল অবস্থা, সেই সময় চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জের ক'জন চাল ব্যবসায়ী শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু দর্শনে চলেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস ও যাদবেন্দু ঘোষও। যাদবেন্দুর ছিল আবাল্য বৈষ্ণব-ধর্মতৃষ্ণা। কিন্তু মেদিনীপুর দাঁতনের কাছে যাদবেন্দু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাদবেন্দুকে এক চটিতে রেখে সঙ্গী-সাথীরা এগিয়ে যান।

শ্রীক্ষেত্রে যেতে না পারার দুঃখে যাদবেন্দু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছেন। প্রবল অসুস্থতার মধ্যে তিনি রাত্রে অনুভব করলেন এক মাতৃমূর্তি যেন পরম স্নেহস্পর্শে তাঁর সেবা করছেন। ভোররাত্রে আচ্ছন্নের মধ্যে তিনি দেববাণী শুনলেন, 'যাদবেন্দু, তোমাকে আর পুরীতে যেতে হবে না। সুস্থ হয়ে চন্দননগরে ফিরে গিয়ে মন্দির নির্মাণ করে আমার বামনমূর্তি প্রতিষ্ঠা কর। সেখানে নিত্যপুজো করলে আমার পুজো করা হবে এবং তোমারও মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' ঘুম ভেঙেই যাদবেন্দু দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আর দেরি না করে প্রফুল্লচিত্তে চন্দননগরে ফিরে এলেন।

পথিমধ্যে আর এক সহযাত্রী হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাসও একই সময়ে জগন্নাথদেবের এক স্বপ্নাদেশ পান। তিনিও কালবিলম্ব না করে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার মানসে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ও ব্যবসা যাদবেন্দুকে দিয়ে যান।

কয়েক বছরের মধ্যে যাদবেন্দু গঙ্গার পশ্চিমকূলে নীলগঞ্জ বাজারের মধ্যে এক সুরম্য মন্দির স্থাপন করলেন। ১৭৬৩ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সমস্যা হলো দেবমূর্তি নির্মাণের। দারুব্রহ্ম ছাড়া তো জগন্নাথ দেবের মূর্তি তৈরি হয় না। যাদবেন্দু গভীর চিন্তায় পড়লেন, কোথায় পাবেন দারুব্রহ্ম! চিন্তায় এক বছর অতিক্রান্তের পর এক রাতে দৈববাণী পেলেন, 'কাল ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়েই দেখবে এক খণ্ড কাঠ ভাসছে। সেই কাঠ তুলে স্থানীয় শিল্পীকে দিয়ে বামন মূর্তি তৈরি করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।' ভোর রাত্রে ওই কাঠ দেখে ধীবরদের নিয়ে কাঠ তুলতে নামেন। কিন্তু কাঠটিকে এক চুলও নড়ানো গেল না। ব্যথিত যাদবেন্দু প্রার্থনায় বসলেন। সেই রাতে ফের স্বপ্নে নির্দেশ পেলেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোনও মানুষের উচ্ছিষ্ট অন্ন ওই কাঠে নিক্ষেপ করলে তবেই কাঠ তোলা যাবে। যাদবেন্দু জেলেপাড়ার ধীবরদের জনে জনে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হলেন। কেউ একাজে রাজি নয়। শেষে এক অশীতিপর বৃদ্ধ পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় নিজের উচ্ছিষ্ট অন্ন গঙ্গায় ভাসমান কাঠে ফেললেন। কাঠ সচল হয়ে উঠতে সহজেই দারুব্রহ্মের কাঠ তোলা গেল।

মহাপ্রভু জগন্নাথ চন্দননগরবাসীদের প্রেমে ও ভক্তিতে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে ধীবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে চন্দননগরের জগন্নাথদেবের অটুট সম্পর্ক। আজও ধীবররা ছাড়া রথ অচল। ঠাকুর তোলা, চতুর্দোলা করে রথে বিগ্রহ নিয়ে আসা এসব কাজ ধীবররাই করে থাকে। অন্যত্র এরা অস্পৃশ্য, কিন্তু চন্দননগরের শ্রীমন্দিরে এদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

১৭৬৫ সালে লক্ষ্মীগঞ্জের শ্রীমন্দিরে সৎস্বরূপ জগন্নাথ, আনন্দস্বরূপ বলরামজী ও চিৎস্বরূপ সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় রথযাত্রার প্রস্তুতি। ১৭৭৪ সালে নিজের বাগানের নিমকাঠ দিয়ে ৩৬ ফুট উঁচু চারতলা রথ নির্মাণ করেন যাদবেন্দু। মেলা ও বিনোদনের আয়োজনও করা হয়। যাদবেন্দু প্রবর্তিত রথযাত্রা আজও চন্দননগরকে মহিমান্বিত করে।

কিন্তু চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জের যাদবেন্দুর মন্দির ও পুরুষোত্তমের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে পুরীর একদল পাণ্ডা আপত্তি জানান। কারণ যাদবেন্দু কায়স্থ। তাই কোনও ব্রাহ্মণ হস্তে মন্দির দান করা উচিৎ। এমনকী ভগবানকে ভোগ নিবেদনের অধিকারও তাঁর নেই। কিন্তু যাদবেন্দু রাজি না হওয়ায় পাণ্ডারা বলেন, নিম কাঠের গোপীনাথ-মূর্তি তৈরি করে আলাদা মন্দির তৈরি করে এবং দেবত্র সম্পত্তি হিসেবে ব্রাহ্মণকে দান করলেও চলবে। তখন গঙ্গার ধারে রামেশ্বর ঘাটে গোপীনাথ মন্দির স্থাপিত হয়। রথের দিন গোপীনাথজীকে জগন্নাথ মন্দিরে আনার পর উল্টোরথ পর্যন্ত ভোগ দেওয়া হয় জগন্নাথের সামনে। ভোগে বিশেষ পদ হিসেবে থাকে মালপো। বছরের অন্যান্যদিন লুচি ভোগ দেওয়াই রীতি। উল্টোরথের আগের দিন মন্দির থেকে নারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে। দু'তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পায়।

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই রথ ১৮০ বছরেরও বেশি চলার পর জীর্ণ হলে রথ পরিচালন কমিটি অনুরূপ আর একটি লোহার রথ নির্মাণ করান। ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোর অ্যাঙ্গাস-এর তৈরি ৫০ টনের এই রথ তৈরিতে খরচ পড়েছিল ৫০ হাজার টাকা। ১৯৬২ সালে নির্মিত ৯ চূড়া বিশিষ্ট এই রথের উচ্চতা ৩৪ ফুট, চওড়া ২২ ফুট। যাদবেন্দু রথের চাকা থেকে চূড়া প্রতিটি অংশে শাস্ত্রকে প্রতিফলিত করেছিলেন। সেই রথের মতো এটিতেও তিন সারিতে ৪ ফুট ব্যাসের ১৪টি চাকা রয়েছে, যার প্রতিটি শাস্ত্রীয় নাম পঞ্চ ভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং চতুরেন্দ্রিয়— পানি, পাদ, বাক্ ও মন। এক তলে চারকোণে চারটি অর্থবহ নারীমূর্তি আছে। একজন জপমালা হাতে, একজন তবলা বাজাতে, একজন মাছ কাটতে এবং অন্যজন শিশুকে স্তন্যপানে রত। দ্বিতলে দু'টি বেগবান অশ্ব, যাদের শাস্ত্রীয় নাম প্রজ্ঞা ও অনুজ্ঞা, রথ টানছে। অক্রূর রথের সারথি। তৃতীয় তলের চারদিকে শাস্ত্রীয় দ্বারপাল— ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের রথ রক্ষা করছেন। চতুর্থ তলে যেখানে তিন বিগ্রহ উপবিষ্ট, তার দু'পাশে দুই শ্বেত মরাল জয়া ও বিজয়া শোভিত। প্রতিটি চূড়োয় একটি করে প্রতীকি চক্র, একটি ঘণ্টা, একটি চামর ও একটি ধবজা রয়েছে।

রথের দিন জগন্নাথদেব সাজেন রাজবেশে। পরের কতদিন তাঁর একেক সাজ— রাখালবেশ, কোটালবেশ, বাবুবেশ, চতুর্ভুজবেশ।

প্রতিবছর আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্র দ্বিতীয়া তিথিতে এই সুবিশাল রথ লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার থেকে জি টি রোড ধরে তালডাঙা অভিমুখে টানা হয়। দিনের পুণ্যলগ্নে ১২০ ফুট লম্বা দু'গাছি রথের রশি ধরে টানলে ও রথরেণু শরীরে নিলে পাপমুক্তি ঘটে। রথানুগমনের প্রাক্কালে বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে স্বর্গের অমরাবতীতে স্নানের পুণ্যার্জন হয়। এমনই বিশ্বাস, এমনই ভক্তি আর ধর্মচেতনা শতশত পুণ্যার্থী নরনারীকে বছরের পর বছর টেনে আনে চন্দননগরের এই রথযাত্রায়।

স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পূর্ণযাত্রা উৎসবের দিনে চন্দননগর এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। রথের মেলা ও বিনোদনে মেতে ওঠে চরাচর। পুতুলনাচের আসরে এককালে তিনশ-পুতুল দিয়ে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সাজানো হোত। মেলার রূপ বদলেছে। হাইটেক বিনোদনের যুগ এসেছে, কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে জগন্নাথদেব আর রথযাত্রা।

(তথ্যসহায়তা ঃ বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ রথযাত্রা—দেবযানী বসু)

রাগ প্রশমনে ধ্যান

চৈতালী চন্দ।। বর্তমান গতির যুগে আমাদের ধৈর্য ও সহনশক্তি অনেক কমে গেছে। ১০০ বছর আগে লোকেদের মনে ধৈর্য ও সহনশক্তি জন্য প্রত্যেক পরিবারে যে শান্তি ছিল তা আজ হারিয়ে গেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ ক্রোধ। বলা হয় "Anger is one letter short of danger" অর্থাৎ Anger-এর সঙ্গে 'ড্ড' লাগালে হয় Danger।

ক্রোধ মানসিক অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশ। ক্রোধের ফলে রক্তচাপ বাড়ে, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ক্রোধী মানুষের heart attack হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। ক্রোধ এলে শ্বাসের গতি তীব্র হয়, শরীর কাঁপে, হাসি শুকিয়ে যায়, চেহারায় বিরাট পরিবর্তন আসে, শরীরে আসুরিক শক্তি আসে, মুখ থেকে অসংযত কথা বেরোয়। এজন্য ক্রোধকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়। ক্রোধ মানুষের বিবেক নষ্ট করে, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অত্যন্ত প্রিয়জনকে খুন করতে দেখা গেছে। খুনীদের সঙ্গে কথা বললে জানা যায় মুহূর্তের ভুলে তাদের এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। ক্রোধ আসার কিছু কারণ আছে। অহমিকা বেশি থাকে বলে অনেকে রেগে যায়। অনেকে হীনম্মন্যতায় ভোগে বলে রেগে যায়।

যাই হোক ক্রোধ যে বিনাশের কারণ করে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা কথা উল্লেখ করা যাক। কোনো এক গ্রামে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। কোনো একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে। বিবাদ তুঙ্গে ওঠে। গ্রামের অন্যান্য মহিলারা ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঝগড়া থামে না। অতিকষ্টে দুজনের মধ্যে একজনকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়। ক্রোধের রেশ তখনও তার মধ্যে পুরো ছিল। ঘরে তার ১০ মাসের বাচ্চা ক্ষিদেয় কাঁদছিল। ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থায় সে বাচ্চাকে স্তন্যপান করায়। কিছুক্ষণ পর বাচ্চাটা মারা যায়। বলা হয়েছিল ঐ দুধে বিষের সঞ্চার হয়েছিল। এজন্য বলা হয় "If you can suppress a second's anger you can prevent a day's sorrow" ক্রোধের প্রতিকারের জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এই দুনিয়ায় এক জনের সঙ্গে অন্যজনের যখন চেহারাতেই মেলে না তখন ব্যবহারের সঙ্গে মিল হবে এটা ভাবাই ভুল। ক্রোধ যখন আমার ব্যক্তিত্বকে, আমার প্রতিমূর্তিকে নষ্ট করে তখন কেন ক্রোধ করব? অন্যায় দেখলে যখন আমরা রেগে যাই তখন সেটাও তো অন্যায়। অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে শোধরানো যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয় তাই অহংকার কিসের জন্য? এই চরম সত্যকে অনুভব করলে অহংকার কখনই আসবে না।

যে রাগী হয় অন্যরা তার কাছে সহজ হতে পারে না। মায়েরা রাগী হলে সন্তান মিথ্যা কথা বলে। তাই রাগের পরিবর্তে সন্তানের কাছে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করতে হবে। ক্ষমার মতো মহৎ গুণ ধারণ করতে হবে। আমাদের আচরণ যেন কখনই আতঙ্কবাদীদের মতো না হয়।

ক্রোধ এলে কিছুক্ষণের জন সেই স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। মনের মধ্যে শান্তভাব আনতে হবে। এক গ্লাস জল খেয়ে ১ থেকে ১০০ ও ১০০ থেকে ১ গুণে মন শান্ত করতে হবে। ক্রোধ দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানের অভ্যাস করা। গীতাতে এই রাজযোগ (meditation) বা ধ্যানের কথা বারবার বলা হয়েছে।

যে রাগে সে সব থেকে বেশি কষ্ট পায়। কিছুক্ষণ পর সে নিজেই একা থাকতে চায়, শান্তি চায়। জীবনে অশান্তি ও হতাশা আমাদের অনেক পিছিয়ে দেয়। এই হতাশা থেকে মুক্তি দেয় ধ্যান। অপরের ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমরা ক্রোধ করি। ধ্যানের মাধ্যমে আমরা এই সত্যকে বুঝতে পারি, প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। তাই মনে রাখতে হবে—"What is lotted cannot be blotted"। আমরা জানি এই পৃথিবীতে আজ যা আমার আছে কাল তা অন্যজনের। গীতারই কথা— "তুমি কি হারিয়েছো যার জন্য আক্ষেপ করো? তুমি কি নিয়ে এসেছিলে যা তুমি এখানে হারিয়েছো? তুমি খালি হাতে এসেছো, তোমাকে খালি হাতেই যেতে হবে"। সঙ্গে শুধু আমরা নিয়ে যাই আমাদের জ্ঞান, গুণ, সংস্কার। এই সত্যকে অনুভব করার জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। রাজযোগ বা ধ্যান সন্তুষ্টি শেখায়, সব চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে রাখে, অহংকার দূর করে। ধ্যানের মধ্য দিয়ে আসে আত্মবিশ্লেষণ। আমরা বুঝতে পারি কোন্ বিষয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি— ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার? কি চলছে আমার মধ্যে? বদলা নেবার ভাবনা? সমুদ্র যখন শান্ত হয় কখনই তার মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ঠিক তেমনি মন যখন শান্ত থাকে তখন নিজেকে দেখা যায়। নিজেকে চেনা যায়। রাজযোগ বা ধ্যানের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেকে জানতে পারি ও সেই অনুযায়ী নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি, অর্থাৎ ক্রোধকে উপশম করতে পারি। যে ক্রোধী তার ওপর শুভ ভাবনা, শুভ সংকল্পের প্রকম্পন (vibration) ধ্যানের মাধ্যমে অন্য কেউ দিতে পারে, এই প্রকম্পনের দ্বারা ক্রোধী মানুষের পরিবেশকে পরিবর্তন করা যায়। ধ্যান ও যোগের দ্বারাই ইন্দ্রিয়কে বশে আনা যায়, মন কখনই লাগামছাড়া হয় না। ধ্যান শেখায় 'Forgive and forget'। তাই ক্রোধের মতো চরম শত্রুকে জয় করার শক্তি রাজযোগ বা ধ্যান থেকেই প্রাপ্ত করুন।

মেয়েদের কৃতিত্ব ভবিষ্যতে গড়ে তোলার সোপান

মিতা রায়

২৬ মে বুধবার রাতে ট্রেনে ফিরছিলাম। হাওড়ায় নেমেই গুঞ্জন কানে এল, মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সান্ধ্য কাগজ কিনে চোখ বুলিয়ে দেখে বুকটা ভরে উঠল—খবরে এবারেও প্রথম দশে মেয়েদের স্থান আছে। মেয়েদের পাশের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। মেয়েদের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, পরবর্তীক্ষেত্রে মেয়েরা আরও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করে তাদের অগ্রাধিকার কেড়ে নেবে।

বাঁকুড়া জেলার রুচিরা প্রতিহার চতুর্থ স্থানাধিকারী। এছাড়া, প্রথম দশজনের মধ্যেও মেয়েরা আছে। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেও মেয়েরা ছেলেদের টপকে প্রথম সারিতে আসতে পারেনি। কিন্তু লড়াই চলেছে ভেতরে ভেতরে। কারণ, নারী যখন থেকে নিজের অধিকার অর্জন করতে শিখেছে তখন থেকেই বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে প্রতিকুল পরিস্থিতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মাধ্যমিকে মেয়েদের সাফল্যের পরপরই ৫ জুন শনিবার হতবাক করা ফলাফল নারীসমাজে আরেক সু-বার্তা এনে ছিল—উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকার শীর্ষে রয়েছে এক ছাত্রী। শহর জীবনের কোলাহলের বাইরে উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরের ছাত্রী পল্লবী সাহা। মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী পল্লবী আরও উদ্যম ও সাহস নিয়ে নিজের জেলাকে শীর্ষে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব দেখাল কোনও গৃহ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই। মা-বাবা উভয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আছেন শিক্ষকতার পেশায়। দু'জনের সহায়তাই ওকে এত বড় সাফল্য এনে দিয়েছে। পল্লবী দিনে আট-দশ ঘণ্টা পড়ত তো বটেই, বন্ধুদেরও পড়ার টিপ্‌স্ দিয়ে দিত। পল্লবীর ব্রত ডাক্তার হয়ে দরিদ্র জনগণকে সেবা করা। সমাজসেবা করা ইদানিং অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রীদেরই লক্ষ্য।

গত বছরের তুলনায় এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার কমলেও ছাত্রীদের সামান্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ইদানিং এ ধরনের ভাল ফল করছে মেয়েরা, এ ব্যাপারে ওদের পেছনে কি কাজ করছে—প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী দেবী ঃ আমরা যখন পড়াশোনা করেছি, তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাবনা তেমন কাজ করত না। কারণ, সাধারণ সংসারের যে ছবি দেখতাম, অর্থাৎ মেয়েদের বিয়েটাই সব। সুতরাং পড়াশোনা করে কিছু করার স্বপ্ন কাজ করত না। কিন্তু ইদানিং

মেয়েরা অনেক বেশি উচ্চকাঙ্ক্ষী। নিজের পায়ে দাঁড়াব, একটা কিছু করে দেখাব— এই জেদী মনোভাব তাদের এগিয়ে যেতে সাহস জোগাচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিকে সফল ছাত্রী রিমা দাস জানান—দেখুন, মেয়েদের ওপর অত্যাচার চিরদিন চলে আসছে। আজও দেখতে পাই, শুনতে পাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই যে পুরুষদের প্রতাপ তাকে আমরা মানব না। অত্যাধুনিক যুগে বসে আমরা কখনই ছেলেদের এতটা অত্যাচার করতে দোব না। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমরাও পারি।

পাশের বাড়ির প্রবীণা শেফালি মাসিমা নাতনির মাধ্যমিকের ফলাফলে খুব খুশি। চারটেতে লেটার পেয়ে খুব ভাল করেছে। আফশোস নেই তাঁর। তবে নাতনিকে উৎসাহ দেন এবং বলেন, সে যেন মাথা উঁচু করে চলতে পারে। তবেই দেশের মঙ্গল হবে। বলেই স্বামীজীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন—যে দেশে নারীজাতির সম্মান নেই, সে দেশের উন্নতি নেই।

এটা ঠিক যে, মর্নিং শোজ্ দ্য ডে। সুতরাং বর্তমান প্রজন্ম যদি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলে তাহলে ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড দৃঢ় হবে। দেশের সাংগঠনিক শক্তি সবল হবে। আজকের প্রজন্ম ভবিষ্যত নাগরিক। তাদের মধ্য দিয়ে এবং তাদের আচরণ গতিবিধির মধ্য দিয়ে আরেকজন শিক্ষালাভ করবে। তবেই সমাজে নারীদের অবস্থান করা হবে।

প্রতিবন্ধী নাসিমার কৃতিত্ব

জন্ম থেকেই সুস্থ ছিল নাসিমা খাতুন। কিন্তু সে জানত বিধি বাম হবে তার শৈশবে! অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাত-পায়ের শক্তি বা সাড় হারিয়ে ফেলে। নামেই প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা তাকে দমাতে পারেনি। উত্তর চবিবশ পরগণার বারাসতের বারো মল্লিকা গ্রামের বাসিন্দা নাসিমা খাতুন মুখ দিয়ে লিখে এ বছরে পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল থেকে সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পাশ করে। শুধুমাত্র গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে তাই নয়, পরবর্তীদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল চিরদিন।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ১

রাম থেকে পরশুরাম। ভগবান বিষ্ণুর অবতার। তিনি পরশু অর্থাৎ কুঠারধারী বলেই পরিচিত।

পৃথিবীর কল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন পরশুরাম। (চলবে)

মালদায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'র শিবির

গত ৬ জুন মালদার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদা নগরের ৫৩ জন সেবিকা ও আচার্যা মিলে একটি একদিনের শিবিরের আয়োজন করেন। সমিতির দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া সরস্বতী তাঈ আপ্টের জন্মশতবর্ষ পালনও করলেন তাঁরা ওই শিবিরে। সকাল ৯ টায় ধবজত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বনবাসী সমাজের গুরুমা রেখা হেমব্রম। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গের অভিভাবিকা বন্দনা রায়, সম্ভাগ সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার প্রমুখ। সন্ধ্যেয় সমিতির শাখা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিদর্শক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার বক্তব্য রাখেন।

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বৈঠক

গত ১৮ ও ১৯ জুন হিমাচল প্রদেশের সিমলায় আদর্শ নগরের সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কার্যকারিণী সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে ২৩টি রাজ্যের ৯০ জন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনে এক আলোচনা চক্রে হিমাচল প্রদেশের স্কুল এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোহনলাল গুপ্তা প্রধান বক্তা এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরেশ ভরদ্বাজ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কার্যকারিণী সমিতির সদস্য হিসেবে অজিত বিশ্বাস ও প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ সাহা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আগামী ১ ও ২ অক্টোবর টাটানগরে শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন এবং আগামী ১১-১২ সেপ্টেম্বর বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসঙ্ঘের উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের ৫৭তম বলিদান দিবস

গত ২৩ জুন প্রতিবারের মতো এবারও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৫৭তম বলিদান দিবস পালন করল তাঁরই নামাঙ্কিত স্মারক সমিতি। সমিতির সহ-সভাপতি অভিতাভ ঘোষ কেওড়াতলা মহাশশ্মানে শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিবেদীতে পুষ্পার্ঘ্য দেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক তথাগত রায়।

ওইদিন সন্ধ্যেয় স্টুডেন্টস হলে এক সভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট মার্কেটিং বোর্ডের চেয়ারম্যান নরেন চ্যাটার্জী, অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক প্রশান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ ভাষণ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইনজীবী অজয় নন্দী।

বিজেপি-র পথ অবরোধ

পেট্রোপণ্যের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১ জুলাই সারা রাজ্যব্যাপী পথ-অবরোধ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বিজেপির বরাহনগর মণ্ডলের উদ্যোগে বনহুগলী বি টি রোডে দুপুর নাগাদ পথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। অবরোধ কর্মসূচীতে জনাপঞ্চাশেক বিজেপি কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

□ □ □

গত ১৩ জুন বেতড় শিক্ষায়তন ফর গার্লস হাইস্কুলে ভারতীয় জনতা পার্টির শিবপুর মণ্ডলের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অসীম ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ওপেন হাউস সেশন

গত ১৯ জুন বিকেলে হাওড়ার ওপেন হাউস সেশন কমিউনিটি হল (ইছাপুর টেলিকম হাউজিং কমপ্লেক্স)-এ ওপেন হাউস সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বি এস এন এল-এর হাওড়ার এরিয়া ম্যানেজার জহর দাস এতে সভাপতিত্ব করেন। এই সেশনগুলিতে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের টেলিফোন বা মোবাইল গ্রাহক ও বুথ এজেন্টরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যার ফলে কর্তৃপক্ষ, তাদের উন্নত পরিষেবা দিতে পারেন। প্রসঙ্গত, বি এস এন এলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর কলকাতা টেলিফোনস-এর বিভিন্ন অঞ্চলে ওপেন হাউস সেশনের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মিশনের কার্যক্রম

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড চ্যারিটি (ইমসচ)-এর উদ্যোগে গত ২৪ জুন ঝাড়খণ্ডের রাঁচীর থরপাখনা এবং ধুডুয়া গ্রামে মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরামর্শদান ও পুনর্বাসন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২৯৩ জন মাদকাসক্ত অংশগ্রহণ করেন। এর পরের দিন রাঁচীর আরও দু'টো গ্রাম ডুরান্ডা এবং বাড়িয়াটু-তে মাদকাসক্তদের 'নারকোটিক্স অ্যানোনিমাস'- এর মাধ্যমে পরামর্শদান, প্রতিবেশী সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদকাসক্ত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে ৩০৯ জন অংশগ্রহণ করেন। ২৬ জুন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর-এর 'বেগুনবেড়িয়া' এবং 'বাড়সুন্দরা' গ্রামে মাদকাসক্তদের জন্য এবং মাদক সেবনের মাধ্যমে এইচ আই ভি এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ, সচেতনতা এবং কাউন্সিলিং শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন ৩৬২ জন।

বলাগড়ে সন্ত সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলাগড় প্রখণ্ডের পরিচালনায় গত ২৭ জুন, কোলড়া বিপত্তারিণী মন্দিরে সন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সারাদিনব্যাপী সম্মেলনে আগত সন্তগণ এবং কার্যকর্তাবৃন্দ রামমন্দির নির্মাণ, গোরক্ষা ও গঙ্গার নির্মল ধারা প্রবাহের উপর বিশদ আলোচনা করেন। বর্তমানে ভারতে হিন্দুধর্মের উপর নানাভাবে যে আঘাত আসছে এবং মুসলিম সংরক্ষণ হলে আমাদের দেশকে যে এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়তে হবে— সে সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত সন্তগণ সকলকে অবহিত করেন।

শোক-সংবাদ

শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক প্রদীপ কেডিয়ার পিতৃদেব দুর্গাপ্রসাদ কেডিয়া গত ১৪ জুন ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর চার পুত্র ও চার কন্যা বর্তমান।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের রোষে এবার লেখক হরিরাম গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউ পি এ সরকারের কোপে পড়ল 'নেহরু-গান্ধী পরিবার ঃ সেকুলার অথবা বর্ণসংকর' শীর্ষক পুস্তকটি। 'বর্ণসংকর' শব্দবন্ধনীটির কারণে বইটির প্রকাশক এবং লেখকের ওপর বেজায় অসন্তুষ্ট হয়েছে সরকার। বইটির লেখক ভুপাল-নিবাসী হরিরাম গুপ্তা। তাঁর বক্তব্য —'বইটির উদ্দেশ্য

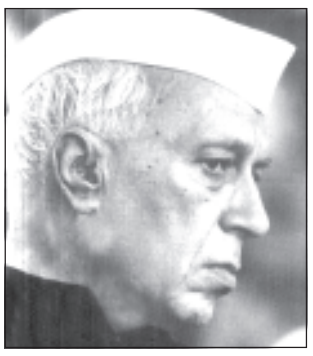

হলো, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের এবং আপামর জনগণকে অবহিত করা যে হিন্দু সমাজ তাদের (গান্ধী-নেহরু পরিবারের) দৃঢ়মুষ্টি থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে।" হরিরাম গুপ্তা জানিয়েছেন জনতা দলের নেতা সুব্রামনিয়াম স্বামী তাঁকে একাজে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গত, জওহরলাল নেহরু ও কমলা নেহরুর কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে বিয়ে হয় এক মুসলমানের, নাম ফিরোজ শাহ। আবার ফিরোজ-ইন্দিরার পুত্র রাজীবের সঙ্গে বিয়ে হয় এক বিদেশী খৃষ্টানের। নাম সোনিয়া মাইনো। সুতরাং গান্ধী-নেহরু পরিবারে বিশেষত বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের একটা সংমিশ্রণ ঐতিহ্যগতভাবে বরাবর চলে আসছে। হরিরাম একেই 'বর্ণসংকর' বলে অভিহিত করেছেন। তাতেও কারুর কিছু বলার থাকত না কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নেহরু-গান্ধী পরিবারে যে বিদেশী রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে তার দরুণ নিজভূমি ভারতবর্ষেই বারংবার বিপন্ন হয়েছে হিন্দুরা। নেহরুও এককালে বলেছিলেন যে তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় হতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে ইসলামপন্থী এবং কথা বলার ক্ষেত্রে বৃটিশদের ইংরেজি ভাষাতেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, বইটিতে জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে নাকি এমন সব কুৎসা রটনা হয়েছে যা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত করতে পারে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ, কোনও প্রমাণ ছাড়াই স্রেফ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গান্ধী-নেহরু পরিবারের বর্তমান সদস্যরা ইউ পি এ সরকারের মাধ্যমে বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই বইতে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর 'বিজনেস ডিলিং' (ব্যবসায়িক রফা) সংক্রান্ত দু'টি পৃথক চ্যাপ্টার রয়েছে। দু'টিরই হিন্দী অনুবাদ হয়ে হরিরামের বইতে তা সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু মূল ইংরেজি কপিটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রচারিত। যদিও বইটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু ইন্টারনেটে উপরিউক্ত প্রবন্ধটি এখনও দৃশ্যমান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২০০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan,P-36, C.R. Avenue,Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

অনশনে গ্রামীণ ডাক পরিষেবা কর্মীরা

সংবাদদাতা॥ আঠাশ দফা দাবীতে কলকাতায় ডাক পরিষেবার প্রাণকেন্দ্র জেনারেল পোস্ট অফিসের অলিন্দে গত ৫ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছেন গ্রামীণ ডাক বিভাগের কর্মীরা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবী ঃ

১। গ্রামীণ ডাক সেবা (জি ডি এস) বিভাগের কর্মীদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে এবং মাইনে, পেনসন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

২। বিভাগীয় অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় জি ডি এস কর্মীদেরও সমহারে বোনাস দিতে হবে।

৩। আর পি এল আই-এর ক্ষেত্রে কর্মীদের কমিশন এবং ইনসেনটিভ দেওয়ার পদ্ধতি সহজতর করতে হবে।

৪। জি ডি এস কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে তার আর এম এস শাখার কর্মীদেরও স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে।

৫। শাখা পোস্ট অফিসে নিয়মিত হারে 'অফিস মেটিরিয়াল' সরবরাহ করতে হবে।

৬। পোস্টম্যানের শূন্যপদে পরীক্ষার মাধ্যমে নতুনদের পোস্টম্যান নিয়োগ না করে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জি ডি এসদের সেই পদে নিযুক্ত করলে কাজের অনেক সুবিধা হবে।

৭। পি এ ক্যাডারের ষাট শতাংশ শূন্য পদে 'সিনিয়র' এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জি ডি এস কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে। বাকি চল্লিশ শতাংশের নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিতে হবে।

৮। জি ডি এস পদের ক্ষেত্রে ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের আনাই হবে অগ্রাধিকার।

৯। পুরো সময়ের ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের জন্য আলাদা বিভাগ চালু করা দরকার।

১০। স্বচ্ছ ডাক প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে হোম ডিভিশনের পোস্ট অফিসগুলির সুপারিনটেনডেন্টদের পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেও কোচ হিসাবে মারাদোনা প্রতিষ্ঠিত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। এই প্রতিবেদন যখন দিনের আলো দেখবে ও পাঠকের হাতে পৌঁছবে, ততক্ষণে বিশ্বকাপের দিক-চক্রবাল মোটামুটি জানা হয়ে গেছে সবার। তবে যে

খেলার জগৎ

দলই ফাইনালে উঠুক বা কাপ জিতুক, এই বিশ্বকাপে মুখ্য চরিত্র হিসেবে তাকে ছাড়া কাউকেই ভাবা সম্ভব নয়। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা গোটা জীবনজুড়েই বোধহয় 'গ্লোবাল মিডিয়ার' যাবতীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবেন। যতই চারপাশে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের বড় মাপের ব্যক্তিসত্ত্বারা বিরাজ করুক না কেন, আসলে ফুটবল আর মারাদোনা অভিন্ন হৃদয়, পরস্পরের পরিপূরক।

বিশ্বকাপে দল নিয়ে আসার আগে মারাদোনার কোচিং ও দল পরিচালনা নিয়ে অনেক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল। মারাদোনার মতো বেহিসেবি, বোহেমিয়ান এক মানুষ কিভাবে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলকে চালনা করবেন। দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার জনসংযোগ ও ভাব বিনিময় কতটা ধরে রাখা সম্ভব এসব আর কি। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটি থেকে সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে

ছেড়েছেন মারাদোনা। মারাদোনা মোটেই ট্যাকটিকাল কোচ নন। সিস্টেম ভিত্তিক থিওরির কচকচানি তার না পসন্দ। নিজে যখন খেলতেন তখন সৃষ্টিসুখে বিভোর হয়ে খেলতেন। প্রথাভাঙা সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনী নব চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হোত তার ধমনীতে। তার জোরে একের পর এক অবিশ্বাস্য কীর্তিকল্প রচনা করেছেন।

কোচ হিসেবেও তিনি মেসি, তেভেজদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। শুধু প্রতিটি পজিশনের খেলোয়াড়দের কার কি দায়িত্ব সেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারপর মাঠে নেমে তারা তার বাইরে বাড়তি কিছু করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে প্রতিটি ম্যাচে নান্দনিক ফুটবল মেলে ধরেছেন। যে শিল্পসুষমামণ্ডিত ফুটবলের জন্য সারা বিশ্বে ব্রাজিলের এত কদর তা এবার ফুল হয়ে ঝরে পড়েছে আর্জেন্টিনার ফুটবলে। তার জন্য সব কৃতিত্ব প্রাপ্য মারাদোনার। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার হৃদয়ের চমৎকার সম্পর্ক দেখে মুগ্ধ কোটি কোটি দর্শক। প্রতিটি খেলোয়াড়দের যেভাবে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে তা ভবিষ্যতের কোচেদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে। কোচের এই প্রগাঢ় ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিটুকুই একটা দলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য করে। কোনও তত্ত্ব বা স্ট্রাটেজি দিয়েই এর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। মারাদোনা নিজেও জানেন স্ট্রাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণে তার সীমাবদ্ধ তার কথা।

এই বিষয়ে তার থেকে অভিজ্ঞ ও উন্নত কোচ বহু আছেন। কিন্তু তারা সবসময় বড় আসরে সফল হতে পারেন না। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের হৃদয় ও মননের সুর-তাল-লয় মিললে একটা দল যে কত ভাল খেলতে পারে, এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার খেলাই তার প্রমাণ। কাজেই ফিফা ও 'কিং পেলে' যতই তার পিছনে লাগুক, মারাদোনা প্রমাণ করে দিয়েছেন খেলোয়াড় ও কোচ দুই ভূমিকাতেই তিনি বিশ্বফুটবলের এক অনন্যসাধারণ চরিত্র।

রেফারিং নিয়ে ভাবা উচিত ফিফার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। রেফারিরাও মানুষ আর মানুষমাত্রেই ভুল করে। এই অজুহাতে ফিফা এবারের বিশ্বকাপে রেফারিদের ভুল সিদ্ধান্তকে ছাড় দিলেও ব্যাপারটি নিয়ে অনেক জলঘোলা হবে। কতিপয় রেফারির অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে এত দুর্বল হবে। রেফারিদের সর্বোচ্চ মানের ফিটনেস, রিফ্লেক্স ও আইকিউ নিয়ে বিশ্বকাপে আসতে হয়। তার সঙ্গে দরকার অসামান্য ব্যক্তিত্ব। গোটা বিশ্বের খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, মিডিয়াকে সামলাতে হয় রেফারিদের। বহুক্ষেত্রে বিশ্বকাপে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েও কোনও ফল পায়নি। তাহলে কি ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মতো হেভিওয়েট দল ফিফার প্রসাদধন্য— এ প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে বড় বড় শিল্পবাণিজ্য সংস্থার বিজ্ঞাপন, টিভি সম্প্রচার সত্ত্ব বাবদ আরও

কপাল পুড়েছে মেক্সিকো, আইভরি কোস্টের মত দলগুলির। কোনও ক্ষেত্রে পরিষ্কার অফসাইড থেকে গোল হয়েছে, আবার কোনও ম্যাচে পরিষ্কার হ্যাণ্ডবল থেকে একটি নয় দু-দুটি গোল করা সত্ত্বেও রেফারি তার প্রতিবিধান করেননি। দুটি ক্ষেত্রেই হেভিওয়েট দলগুলি রেফারি ও ফিফার আনুকূল্য পেয়ে গেছেন। এভাবে চললে ছোট শক্তির দেশগুলি পরবর্তীতে বিশ্বকাপ বয়কটও করতে পারে।

ব্রাজিল-আইভরি কোস্ট ম্যাচে লুই ফাবিয়ানো এরিয়াল অ্যাটাকের সময় হাতে বল লাগিয়ে গোল করেছেন দুবার। দুবারই রেফারির দৃষ্টিগোচর হয়নি তা। বিশ্বকাপের মত একটা আসরে রেফারির দৃষ্টিশক্তি কেন স্তর থেকেও চাপ আসে। কারণ বিশ্বকাপ হলো সব অর্থেই বিশ্বযুদ্ধ বা বিশ্বসঙ্ঘ।

আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো ম্যাচে প্রথম গোলটার কথাই ধরা যাক। তেভেজ পরিষ্কার অফসাইড থেকে গোল করে মেক্সিকোর খেলোয়াড়দের যাবতীয় মনোবল ভেঙে দেন। ওই ম্যাচে তারপর আর প্রত্যাশিত লড়াই দিতে পারেনি মেক্সিকো। অথচ এই ম্যাচটি ঘিরে অনেক প্রত্যাশা ছিল। দুটি দলই 'ক্লাসিকাল স্টাইল' ধরে খেলে। বিশ্বফুটবলে যথেষ্ট ঐতিহ্য ও গৌরবময় পারফরমেন্স আছে মেক্সিকোর। রেফারির দুর্বল ম্যাচ পরিচালনার খেলাটি নিতান্তই সাদামাটা স্তরেই আটকে থাকে। দর্শকরাও বঞ্চি ত হন চোখের আরাম থেকে। মেক্সিকো ফিফায় কয়েকশ কোটি ডলারের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারছে না ফিফা। তাই কি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নিক ব্যাপারটি মনে মনে চান না ফিফার কর্তারা। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর ইউরোপের ইতালি এই তিন দলই ফিফার কাছে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস। বিশ্ব ফুটবলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য আবর্তিত হয় এই তিন দেশকে ঘিরে। ফিফা অবশ্য যথেষ্ট নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খল সংগঠন। বিশ্বজনীন সর্বত্র ফুটবলের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা ধরে রাখতে সচেষ্ট। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে অপেক্ষাকৃত কমশক্তির দেশগুলো রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের চরম খেসারত দিয়েছে, যা ফিফার পর্যালোচনা করা উচিত।

শব্দরূপ - ৫৫৪

অশোকা মুখার্জী

■	১		২	■	৩		৪
■		■		■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■		■	১০	■
১১			■	১২			■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. মহাদেবের অস্ত্র, ৩. যদুবংশীয় রাজা শিনির পৌত্র, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন, এর অন্য নাম যুযুধান, ৬. উপবীত, ব্রাহ্মণের কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র, ৭. রাজ্য-শাসনের সুবিধি, ইনি ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের কণিষ্ঠতম মূঢ় ও অকৃতবিদ্য, ৮. লিপিকর, যে শুনিয়া লেখে, ৯. সাদৃশ্যহীন, অসমতল, ১১. ওই গুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে—"পূরণীয় স্থানে পৃথিবী তৎসম শব্দে, ১২. ভারতীয় আর্যদের দ্বিতীয় বর্ণ।

উপর-নীচ ঃ ১. তৎসম শব্দে তিন সংখ্যায় সমষ্টি, ২. স্ত্রীর পরিচয়ে নারায়ণ, ৩. ধার্মিকতা বা সততা, ৪. ছোট পাখিদের কোলাহল ধ্বনি, ৫. শ্রীকৃষ্ণের চক্রাস্ত্র, ৮. তারকাসুরের পুত্র, এক-তিনে কদলী, আগাগোড়া কামরা, ৯. ফুল বিশেষ, প্রথম দুয়ে ও-পরিমাণ, ১০. মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মাতা দানব শিল্পী বিশেষ।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৫২

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩
শৌনক রায়চৌধুরী, কলকাতা-৯

■	■	■	স	■	গি	রি	শ
■	রে	ব	তী	■	ল	■	ক্তি
ক	■	■	প	ব	ন	■	উ
ম	হা	ম	তি	■	■	■	পা
ল	■	■	■	বে	দ	ব্যা	স
লো	■	অ	রি	ত্র	■	■	ক
চ	■	র্চ	■	দ	ক্ষি	ণ	■
ন	য়	না	■	ণ্ড	■	■	■

সমাধান শব্দরূপ ৫৫৩

সঠিক উত্তরদাতা

নীলিমা রায়
নলহাটী, বীরভূম।

ধু	■	ম	রী	চি	■	স্বা	■
ম্র	■	হে	■	দা	নী	য়	■
লো	ম	শ	■	ত্মা	■	ম্ভু	■
চ	■	■	■	■	হ	ব	ন
ন	কু	ল	■	■	■	■	দে
■	ব	■	ব	■	ম	ধু	র
■	ল	খা	ই	■	ক	■	চাঁ
■	য়	■	ঠা	কু	র	■	দ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৫৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ জুলাই, ২০১০ সংখ্যায়।

মাওবাদী সমস্যার দ্রুত সমাধান দরকার

বিশাখা বিশ্বাস

একাদিক্রমে ১৪৪ ধারা বহাল রাখা ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে এক অভিনব এবং বিরল ঘটনা। কিন্তু বিরল ঘটনাগুলির মধ্যে বিরলতম ঘটনা হচ্ছে, এই তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের প্রত্যেকদিন মাও-নাশকতা এবং মানব হত্যার নিষ্ঠুর খবরগুলিকে নানান সংবাদমাধ্যম নানান ভয়াবহতার সাথে আমাদের পাতে পরিবেশন করে চলেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়কালমধ্যে পশ্চিমবঙ্গীয় পুলিশ (বামমার্গী ক্যাডারের সাথে) কেন্দ্রিয় বাহিনী নিয়ে ওখানে কি কি করেছে— কোনও প্রিন্ট/ভিস্যুয়াল মিডিয়াই একদিনের জন্যেও আমাদের তা জানায়নি বা জানাতে পারেনি। কিন্তু একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যে, টাটা-বিড়লাদের সংগঠন ফিকি নাকি সমস্ত সংবাদকেন্দ্রগুলিকেই পরামর্শ দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদীদের (মাওবাদীদের) কেবল ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে প্রচার করো, তাদের মানবহত্যাগুলিকে ভয়ঙ্কর বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতম অপরাধ বলে প্রকাশ করো, কিন্তু এমন কোনও কিছুই করো না যাতে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ পড়ে। ফলে কোনও মিডিয়াই (সেই পরামর্শে অথবা ইউ এ পি এ-র ভয়ে) এখন আর কোনও সরকারকেই চাপে ফেলতে চাইছে না। পরন্তু '২৪ প্রহরের' কোনও কোনও মিডিয়া কিম্বা 'আজকালকার কোনও কোনও সংবাদপত্র সরকারকে জঙ্গলমহলে যেন বাস্তিল দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার উৎসাহে সেই সাফল্যকে ইঁদুর থেকে ব্যাঘ্রে পরিণত করে উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জঙ্গলমহলে আইনের শাসনকে কি প্রতিষ্ঠা করা গেছে? জঙ্গলমহলে প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের অপহৃত আস্থাকে কি ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব হয়েছে? উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়, সেখানে তা কী একটুকুও করা হয়েছে? মানুষ তা জানে না, কেন না কোনও সংবাদকেন্দ্রই তা আমাদের জানায়নি। যেটুকু জানা গেছে তা হোল সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা সমাহর্তা বলেছেন, 'সাফল্য এসেছে'। রাজারাণীদের হাতীশালে এতো হাতী, ঘোড়াশালে এতো ঘোড়া, শিবিরে শিবিরে এতো এতো সেনা— কিন্তু কেবল দুইটি শব্দের জবাবঃ সাফল্য এসেছে? অতএব জেলার সেই স্বনামখ্যাত এস. পি. মনোজ ভার্মাকেই বলতে হয়েছে ২০০৯-এর ১৮ জুনের আগে পুলিশ লালগড়ে কোথাও যেতে পারতো না, (সেই পুলিশ বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রিয় ফোর্স সাথে নিয়ে) এখন কোথাও কোথাও যেতে পারছেন! বোঝা গেল এরই নাম যৌথবাহিনীর সাফল্য'। বোঝা গেল এ যেন সেই সাফল্য যে সাফল্যে ভর করে 'দেশ হিতৈষী' লেখে '৮১টি পৌরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের ফল মোটেই ভালো নয়, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা ভালো হয়েছে'। মিডিয়ার ভাবখানা এমনই যেন রাজ্যপুলিশ এবং কেন্দ্রিয় ফোর্স যৌথভাবে দুই-য়ে মিলে দিল্লীর লালকেল্লার ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে এখন সেখানে তেরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে।...

ফলতঃ লালগড়ে সাফল্য নিয়ে এখন আর মন্ত্রী-সান্ত্রীরা কেউ কোনও কথাই বলছেন না— এখন কথা বলছে প্রশাসন (কমরেড জ্যোতি বসু অমরলোকে অন্তিম শয়ান, এখন আর কেউ বলেন না আমরা-আমলার মুখ দিয়ে কথা বলি না!)। শুনেছিলাম, শিশির ভাদুড়ি নাকি এক সন্ধ্যায় চেংগিজ খাঁ সেজে পরের সন্ধ্যায় শেরশাহ হয়ে রাজ্য পুনর্গঠনে মন দিতেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সকালে আর এস এস— বিজেপির 'মাথা ভেঙে দিয়ে' বিকেলেই রাজ্যের উন্নয়নের অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিজেপির 'ভোট-টি' ভিক্ষা করছেন। দোষ নেই। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র, তৃণমূলের শত্রু বুদ্ধের বন্ধু। কিন্তু সাফল্যের পরিমাণটা এখানেও শূন্য—কেননা, বিজেপি বড় শক্ত ঠাঁই— রাজ্যে তার শক্তি সীমিত কিন্তু তার চরিত্রবল অসামান্য।...কিন্তু মমতা ব্যানার্জী কোথায় চলেছেন? তার যে প্রতিবাদী সত্ত্বাটি ঐতিহাসিক টাডা আইনের বিরোধিতা করে অনশনে বসেছিল, আজ রাজ্যে যখন ইউ এ পি এ আইনটি জারী হল তখন তার সেই সত্ত্বাটি কোথায় গেল? যে বিরল প্রতিবাদী চরিত্রটি এরাজ্যের লালগড়ের পুলিশী অত্যাচার এবং সিপিএম-এর হার্মাদবাহিনী নিয়ে এতো সোচ্চার, দিল্লীর সংসদভবনে সেই ব্যক্তিত্বটি আজ নীরব কেন? কোন্ স্বার্থের রুমালে বাঁধা পড়ে মুখখানি তার মূক হয়ে গেল?...

২০০৯-এর ১৮ জুনের আগে পুলিশ লালগড়ে কোথাও যেতে পারতো না, (সেই পুলিশ বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রিয় ফোর্স সাথে নিয়ে) এখন কোথাও কোথাও যেতে পারছেন! বোঝা গেল এরই নাম যৌথবাহিনীর সাফল্য'। বোঝা গেল এ যেন সেই সাফল্য যে সাফল্যে ভর করে 'দেশ হিতৈষী' লেখে '৮১টি পৌরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের ফল মোটেই ভালো নয়, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা ভালো হয়েছে'।

মানসের মানস কি সফল হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৫ জুলাই ভারত বন্ধ ডেকেছিল যেমন বিজেপি, তেমনই বামদলগুলিসহ অন্যান্য অকংগ্রেসি দলগুলিও। কথা হচ্ছে, এইভাবেই জরুরি অবস্থার সময়ের ঐক্য ফিরে এলো কি? দেশের ঘটনার গতি কি সেদিকে যাবে? কারণ ইউপিএ সরকার সবদিক থেকে ব্যর্থ। দেশরক্ষায় উদাসীন— চীন-পাকিস্তান পারমাণবিক চুক্তি হয়েছে, ভারত নির্বাক। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার কেবলমাত্র সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে যে-কোনও দলের সঙ্গে অনৈতিকভাবে হাত মেলাচ্ছে। এই জন্যই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা ব্যানার্জি-কে রীতিমতো খোসামোদ করে চলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি তো 'মহান নেত্রী' বলে গেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে ডাঃ মানস ভুঁইয়া'র উত্থান ঘটলো। এই ঘটনায় আর একটি চিত্র পরিস্ফুট হচ্ছে। তা'হলো সোনিয়া গান্ধী আর এ-রাজ্যের রাজনীতিতে প্রণব মুখার্জির হস্তক্ষেপ চান্ না।

মানসবাবু দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পুরো সময়ের সভাপতি করার কথা বলে আসছিলেন। সোনিয়া গান্ধীর বিবেচনায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস স্থান করার জন্য মানস ভুঁইয়াই উপযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঙ্গলকোটে মানস ভুঁইয়াকে যেভাবে সিপিএম-এর ক্যাডাররা তাড়া করেছিল এবং যার ফলে মানসবাবু কাপড় তুলে অসহায় ভাবে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন— তা চিত্র সাংবাদিকের সৌজন্যে ফুটে উঠেছিল।

বর্তমানে রাজ্য-কংগ্রেসের অবস্থা একেবারেই ছন্নছাড়া। কোনও ব্যক্তির কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত স্ব স্ব জেলায় এক একজন সভাপতি যিনি নিজের মতোন করে চলেছেন। কোনও কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা নেই। একটা কথা সত্য যে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও মাথা ব্যথা নেই। পক্ষান্তরে তাঁরা বুঝেছেন যে এ-রাজ্যে তৃণমূলকে ধরে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়ে দলীয় সংগঠনে জোয়ার আসতে পারে। এর কারণ হলো, এ-রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতার বাইরে থেকে কিছু করতে সক্ষম হবে না।

এখন ডাঃ মানস ভুঁইয়া-কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করেন যে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জির গ্রহণযোগ্য। এদিকে কিন্তু ছোড়দা (সোমেন মিত্র) এ-রাজ্যের কংগ্রেসের ভাঙন ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। মানসবাবু সভাপতি পদে আসীন হওয়াতে রাজ্য-কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই যাবে এবং বাড়বে। তবে একটা কথা সত্য যে ডাঃ মানস ভুঁইয়া ছাড়া বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে আর কারুর নিজস্ব 'বেস' নেই। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়

মানস ভুঁইয়া

সবং-এ মানসবাবুর পায়ের তলায় মাটি আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশা সবং থেকে যদি গোটা মেদিনীপুরে কংগ্রেস বিস্তৃত হতে পারে। এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরে তো অধিকারীদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। পিতা মন্ত্রী এবং পুত্র সাংসদ। যুব নেতা—আর এক পুত্র বিধায়ক। এ আর এক পরিবার তন্ত্রের অধিকারী হয়েছেন। এই পরিবারতন্ত্র একদা তৃণমূলেও চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়াতে পারে।

এখন দেখা যাক মানসবাবু সভাপতি হওয়ার ফলে রাজ্য-কংগ্রেসের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যকে না-জানিয়ে মানসবাবুকে সভাপতি করা হলো। প্রদীপবাবু ক্ষুব্ধ— তাঁর ক্ষোভ কমানোর জন্য নানা পদের কথা শোনানো হচ্ছে। মোটকথা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য-রাজনীতি থেকে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দিতে চান। শেষমেশ মমতা ব্যানার্জি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রদীপবাবুকে আহ্বান জানালে তিনি তৃণমূলে পারেন। এ দিকে আবার তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্য করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশের পথ সুগম করার মানস আছে ডাঃ মানস ভুঁইয়ার। কিন্তু প্রদীপবাবুই কি একমাত্র ক্ষুব্ধ? নির্বেদ রায়, মালা রায় কি চুপ করে থাকবেন। এঁরাও মেদিনীপুরের। নির্বেদ রায় তো এক সময়ে মমতার অন্যতম সহায়ক ছিলেন। মালা রায়ও ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন। শোনা যায় মমতাকে ছাপিয়ে মাথা তোলার দরুণ রায়-দম্পতিকে তৃণমূল ছাড়তে হয়। উত্তরবঙ্গে দীপা দাসমুন্সি কি মানসবাবুর আধিপত্য মেনে নেবেন? না তিনি গণিপরিবারকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গে পায়ের তলায় নিজস্ব মাটি তৈরি করার চেষ্টা করবেন। কারণ দীপা দাসমুন্সি জানেন যে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হবে না। পক্ষান্তরে তাঁর অবস্থানকে দুর্বল করার সব রকম ব্যবস্থা করা হবে। সাবাস ছোড়দা। কলকাতার অধিকাংশ জেলা সভাপতি মানসবাবুকে মেনে নেবে কি? না— কারণ সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনে প্রদীপ ঘোষ (নীলু) অ্যাণ্ড কোং-কে তৃণমূল পর্যুদস্ত করেছে। খালি সন্তোষ পাঠক নির্বাচিত হয়ে বেঁচে গেছেন। প্রদীপ ঘোষ-এর ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য হলো যে, যদি ভালো কাজের তালিকা দেখতে হয়— তবে প্রদীপ ঘোষ এলাকায় কাজের মানুষ হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক গোপনশক্তি কংগ্রেসের মধ্যে নানা কৌশলে প্রদীপকে এবং তাঁর পুত্রবধূকে ধরাশায়ী করেছিল। প্রদীপ ঘোষ কি তৃণমূলে যাবেন? না, তিনি অবস্থার চাপে 'অন্য দলে' চলে যেতে পারেন।

এদিকে সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের যুব-কংগ্রেস-কে ঢেলে সাজানোর জন্য আসছেন। তিনি নাকি প্রদীপ ঘোষ-কে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ-এর প্রস্তাব দিতে পারেন। তাতে কি প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মিটবে? একটা ধারণা চালু করা হচ্ছে যে রাজ্য-মন্ত্রিসভায় যেন তেন প্রকারে অংশগ্রহণ করে সোনিয়া তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাবে? এখন যা পরিস্থিতি তাতে এটা স্পষ্ট— মানসবাবুর পথ কণ্টকাকীর্ণ, তাঁর মাথায় কণ্টক-মুকুট।

Swastika
12 July - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

তৃণমূলের নারকীয় তাণ্ডব বিদ্যার্থী পরিষদের ওপর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কোচবিহার জেলার বক্সীরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের নারকীয় তাণ্ডবের শিকার হলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৯ জুলাই। পৃথ্বীশ চক্রবর্তী নামে বক্সীরহাট কলেজের এক তৃণমূল নেতা সেদিন বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মী চঞ্চলকে শাসায় এই বলে যে, ওই কলেজে বিদ্যার্থী পরিষদ করলে তার ফল ভাল হবে না। এর পরদিন অর্থাৎ ৩০ তারিখ কলেজে অনার্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবীতে পরিষদের একটি কলেজ প্রতিনিধি দল অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে যাবার সময় অতর্কিতে কলেজের মধ্যেই বহিরাগত তৃণমূলবাহিনী একপ্রকার বিনা-প্ররোচনাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে

বক্সীরহাট হাসপাতালে আহতদের দেখছেন রবিরঞ্জন সেন ও পারুল মণ্ডল। (ইনসেটে) গুরুতর আহত সমীক নারায়ণ বাগচী।

তাদের ওপর। চলতে থাকে অবাধে কিল-ঘুষি। কলেজ-কর্তৃপক্ষ সেই সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কলেজের দু-একজন গার্ডও ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেগতিক দেখে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান কলেজ ছাত্রদেরই একাংশ। সেই প্রতিবাদে আপাতত পিছু হটে তৃণমূলের বহিরাগতরা। তবে বিদ্যার্থী পরিষদের কয়েকজন কর্মী যেমন —ধনঞ্জয় বর্মন, সমীর পণ্ডিত, অশোক সরকার, কৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ এই হামলায় গুরুতর আহত হন।

আহতদেরকে বক্সীরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের একজনকে ট্রান্সফার করা হয় তুফানগঞ্জ হাসপাতালে। কলেজ ছাত্রদের বাধায় তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা তখন সাময়িকভাবে পিছু হটলেও তারা তক্কে তক্কে ছিলই। তাই আহত কর্মীটিকে নিয়ে যখন বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে তুফানগঞ্জ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবলু সরকারের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। অ্যাম্বুলেন্স থেকে আহত বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীটিকে নামিয়ে বেদম মার দেওয়া হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে পড়ে পরিষদের অন্য দুই কর্মী অংশুমান দে সরকার ও সমীক নারায়ণ বাগচী। দু'জনকেই লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় সমীকের। আপাতত ছ'টি সেলাই নিয়ে সে বক্সীরহাট হাসপাতালে ভর্তি। পরিষদের ওই আহত কর্মীটিও অন্য সকলের সাথে বক্সীরহাট হাসপাতালে রয়েছেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা স্থানীয় থানায় এব্যাপারে এফ আই আর দায়ের করতে গেলে বক্সীরহাট থানার আই সি তা নিতে অস্বীকার করেন। স্থানীয় সূত্র ওই ইনস্পেক্টরটিকে 'তৃণমূলের দালাল' বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল শেষ অবধি কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে এনিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবী করেন এবং পুলিশ সুপারের অফিসেই এফ আই আর দায়ের করেন। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে বক্সীরহাট থানাও শেষপর্যন্ত পাঁচ তৃণমূলী দুষ্কৃতকারী পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, সুকান্ত পাল, মহেশ বর্মন, রিপন পাল ও বাবলু সরকারের বিরুদ্ধে এফ আই আর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রবল ধিক্কারের মুখে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব এই কুকর্মটিকে সিপিএমের ঘাড়ে চাপাতে চাইলেও সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন যে ঐতিহ্যগতভাবে বক্সীরহাট কলেজ বরাবরই এস এফ আই শূন্য, তৃণমূল-এ বি ভি পি জোটের ছাত্র-সংসদে চলা কলেজ। সেক্ষেত্রে সিপিএম বা এস এফ আই-তো 'পিকচারেই' আসে না। পরিষদের কোচবিহার জেলা সংযোজক বিপ্লব সরকারের বক্তব্য— "সত্তরের দশকের কালো দিনগুলো ফিরে এল বলে। বক্সীরহাটের ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে ক্ষমতায় এলে প্রয়োজনে সিপিএমের থেকেও ভয়ঙ্কর হতে দ্বিধা করবে না তৃণমূল।" প্রদেশ যুগ্ম-সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডলের কটাক্ষ— "তবে পরিবর্তন এলেও পুলিশের ভূমিকাটা বোধহয় বদলাবে না। শাসকদলের লেজুড়বৃত্তিই তাদের ভবিতব্য।"

বক্তব্য রাখছেন শ্রীনন্দকুমার, বসে সভাপতি ডঃ প্রণব রায়।

আমাদের সবার ভাষা সংস্কৃত : শ্রীনন্দকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "আমি কেরল থেকে এসেছি। কেরলের ভাষা মালয়ালাম্। আমি এখন সংস্কৃতে বলছি। আপনারা কলকাতাবাসী। এখানকার ভাষা বাংলা। আমি বাংলা জানি না। আপনারা মালয়ালম্ জানেন না। কিন্তু আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন। এর কারণ, আমাদের সকলের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ আর ভাষা সংস্কৃত।" গত ৩ জুলাই কলকাতার কেশব ভবন সভাগৃহে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন, 'সংস্কৃত ভারতী'-র সর্বভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ নন্দকুমারজী। তিনি সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ কর্তৃক আয়োজিত দশদিনের সংস্কৃত কথোপকথন শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। গত ২৪ জুন থেকে কলকাতায় দশটি স্থানে দশটি সরল 'সংস্কৃত কথোপকথন বা সম্ভাষণ' শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার—স্কুল ছাত্র-ছাত্রী থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, আইটি প্রফেশানাল এবং শিক্ষক-অধ্যাপকরা প্রায় শতাধিক সংখ্যায়

কলকাতায় সংস্কৃত কথোপকথন বা সম্ভাষণ শিবির

ওই দশটি শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সম্ভাষণ শিক্ষার্থী ছাড়া আরও অনেকে সংস্কৃত-অনুরাগী শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। এক কথায় প্রকৃত সংস্কৃতপ্রেমীদের সম্মেলন— মিলনমেলা।

শ্রীনন্দকুমার আরও বলেন, একদা ভারতে সংস্কৃতই কথ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রাচীন আকর গ্রন্থসকল সংস্কৃতে রচিত। যেমন, আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য বেদ। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারতের আয়ুর্বেদের প্রভাব অপরিসীম। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আয়ুর্বেদকে ভিত্তি করেই চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সকল ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা। 'সংস্কৃত ভারতী' সরল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদিন মাত্র দু'ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দিয়ে দশদিনে কথোপকথন-এর প্রশিক্ষণ সারা ভারতে চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই সচেষ্ট হলে সংস্কৃত আবার সর্বসাধারণের কথ্যভাষায় পরিণত হবে। এছাড়াও শ্রীনন্দকুমার চলতি জনগণনায় সংস্কৃতকে মাতৃভাষা হিসেবে নথিভুক্ত করানোর আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রসিদ্ধ লেখক, গবেষক এবং অধ্যাপক ডঃ প্রণব রায় ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ রায় সংস্কৃতের প্রতি সরকারি দুর্লক্ষ্যের বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, একসময়ে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই যাবতীয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। এখন সরকারি অবহেলায় তা বিনষ্ট। এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভারতী-র প্রয়াস প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্য।

এদিন প্রশিক্ষার্থী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী অজিত ভদ্র তাঁর অভিজ্ঞতা সংস্কৃতে ব্যক্ত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ মানবেন্দু মণ্ডল বলেন, সম্ভাষণ বর্গেই তিনি সংস্কৃতে কথা বলা আয়ত্ত করেছেন।

এদিনকার সভা পরিচালনা করেন সম্ভাষণ প্রশিক্ষক বিশ্বজিত প্রামাণিক। সংস্কৃত গান পরিবেশন করেন প্রমিতা ভট্টাচার্য এবং সংস্কৃত ভারতীর পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ স্নেহলতা নস্কর।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com